প্রকাশনার ৩৫ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

পঁয়ত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ১১

নভেম্বর ২০২০ ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ॥ রবি. আউ.-রবি. সানি ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

জেলহত্যা দিবস

বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যতম শোকের দিন ৩ নভেম্বর। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরে ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে ঘৃণিত কাপুরষোচিত এবং কলঙ্কজনক ঘটনা। মুষ্টিমেয় ঘাতকদের এই হত্যাকাণ্ড পুরো জাতিকে লজ্জিত ও স্তম্ভিত করে দেয়। ১৯৭১ সালে জাতির চরম দুর্দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পরে তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা এই জাতীয় চার নেতা যেভাবে হাল ধরে সশস্ত্র স্বাধীনতা অর্জনে জাতিকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান এই জাতীয় চার নেতা ঘাতকদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে লড়াইয়ের জন্য জেলখানাকেই বেছে নিয়েছিলেন। ঘাতকচক্র নিশ্চিত ছিলো এরা জীবিত থাকলে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বেশি দিন প্রয়োজন হবে না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা– জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ পরিচালনা, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল বাংলাদেশ থেকে

কোনদিনও এই ভূখণ্ডকে পেছনে টেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। আর তাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় জেলখানায় শাহাদাৎবরণ করতে হলো এই চার নেতাকে। জাতীয় চার নেতার আত্মোৎসর্গ আমাদের জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনার অন্যতম। কীভাবে নিজের জীবন দিয়ে আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হয়, কীভাবে নেতা, দেশ ও জাতিকে ভালোবসতে হয়– সে শিক্ষা রয়েছে ৩ নভেম্বরের ঘটনার মধ্যে। আপোষকামিতা, সুবিধাবাদিতার বিপরীতে রাজনীতির মহান ত্যাগ তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৩ নভেম্বর। আমরা মহান রাব্বুল আলামিন-এর কাছে মুনাজাত জানাই বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতাসহ এই দেশের সকল শহীদকে জান্নাত দান করুন।

সংবিধান দিবস

প্রতিটি জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জল প্রতীকের অন্যতম সংবিধান। সংবিধান জাতির পবিত্র আমানত। ৩০ লক্ষ শহীদ, ৪ লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জন্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদর্শকে ধারণ করে তৈরি হয় আমাদের সংবিধান। ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে পাশ হয় এই সংবিধান। সংবিধানের কারণে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ৪ নভেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। পৃথিবীর সকল দেশে সংবিধান দিবস গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এর সাবেক চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম-এর সংবিধান দিবস নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম।

মার্কটালি বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে সাংবাদিকতার জন্য তিনি দেশের সাধারণ জনগণের কাছে পরিচিত। বর্তমান সরকারের বিপুল অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাঁকেও স্পর্শ করেছে। সরকারের উন্নয়ন নিয়ে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার অনুবাদ আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব প্রখ্যাত সাংবাদিক তোয়াব খানের একটি সাক্ষাৎকারও আমরা পূনমুর্দ্রন করলাম। সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অজানা অনেক বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের জন্য পদক লাভ করা মুসলিম বীরযোদ্ধা নুর ইনায়েত খানের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখাও প্রকাশ করা হলো। আশা করি এই সংখ্যাটি আপনাদের প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করবে।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

মনযূরুল হক

মহানবী (সা)-এর জীবনী রচনার হাজার বছর♦০৯

পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার

শিক্ষায় বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর অবদান♦২০

কলঙ্কময় জেলহত্যা

মিলন সব্যসাচী

জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতা♦২৭

মো. আশরাফুল ইসলাম

দেশমাতৃকায় নিবেদিত প্রাণ শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান♦৩৩

সংবিধান দিবস

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

জাতীয় জীবনে ৪ নভেম্বর♦৪৬

আন্তর্জাতিক

মূল : স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি

ভাষান্তর : শাখাওয়াত হোসাইন ও সাবিক সিকান্দার

বাংলাদেশ : 'তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে শক্তিশালী অর্থনীতিতে♦৫২

মুজিববর্ষ

সাক্ষাৎকার : তোয়াব খান

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন ছায়াটা সরে যায় তখনই অভাবটা বোঝা যায়♦৫৬

মাহবুব রেজা

পিতাকে নিয়ে কন্যা শেখ হাসিনার বই 'শেখ মুজিব আমার পিতা'♦৭১

মুসলিম বীর

কাজী আখতারউদ্দিন

প্রথম মুসলিম নারী গুপ্তচর অপ্রতিরোধি যোদ্ধা নুর ইনায়েত খান♦৭৬

কবিতা

সোহরাব পাশা
ছায়াসঙ্গী♦৮৭
নীহার মোশারফ
বকধার্মিক♦৮৮
সৌম্য সালেক
১৯৭৫ এবং আজ♦৮৯
মোহাম্মদ ইলইয়াছ
তোমার দয়ালু প্রভাব♦৯০
মনির হোসেন
সমার্থক♦৯১
আব্দুল হাই মোল্যা
চির অম্লান♦৯২
সাম্মি ইসলাম নীলা
একটি পাহাড়ের গল্প♦৯৩
মারইয়াম মনিকা
লাল সিগন্যাল♦৯৪

গল্প

শামস সাইদ
যে রাত খুন হয়েছিল গরাদে♦৯৫

সাহিত্য

মূল : লুইস গ্লাক
ভাষান্তর : আবু মুসা চৌধুরী
'২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন কবির দু'টি কবিতা♦১০৯
গাজী সাইফুল ইসলাম
ইরাকি-স্পেনিশ কবি ও অনুবাদক আবদুল হাদি সদৌনের কবিতা♦১১১

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জব্বার আল নাঈম
স্মৃতিতে ও কবিতায় বেলাল চৌধুরী♦১১৭
মনি খন্দকার
বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র) ♦১২৫

পরশমণি

আল-কুরআন

১। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে যাও ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমু'আ: ১০)*

২। কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা হা-মী-ম-আস্-সাজ্দাহ: ৩৩)*

৩। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।' *(সূরা জাসিয়া: ৩০-৩১)*

৪। আল্লাহ কারো উপর এমন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফলন তারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

৫। জেনে রাখ! নিশ্চয়ই যাঁরা আল্লাহর ওলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন শংকা নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ। *(সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪)*

আল-হাদীস

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন: 'হযরত দাউদ (আ) বর্ম তৈরি করতেন, হযরত আদম (আ) কৃষি কাজ করতেন, হযরত নূহ (আ) কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন, হযরত ইদ্রিস (আ) সেলাই কাজ করতেন এবং হযরত মূসা (আ) বকরী চরাতেন।' *(মুসতাদরাকে হাকীম)*

২। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন: 'নিজের হাতের কাজ ও শ্রম দ্বারা উপার্জিত খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ খেতে পারে না। হযরত দাউদ (আ) নিজের হাতের শ্রমের উপার্জিত খাবার খেতেন।' *(বুখারী শরীফ)*

৩। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন: 'শ্রমিকের কাজ বা কাজের মেয়াদ শেষ হলেই তার মজুরী পুরোপুরি দিতে হবে। *(মুসনাদে আহমদ)*

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি কোন রুজী রোজগারের জন্য শ্রমের পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো গোশতও থাকবে না। *(বুখারী শরীফ)*

৫। মহানবী (সা) বলেছেন: 'কিয়ামতের দিন আমি তিনজন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে তার কাজ আদায় করে বটে, কিন্তু তার মজুরি পরিশোধ করে না । *(বুখারী শরীফ)*

মহানবী (সা)-এর জীবনী রচনার হাজার বছর

মনযূরুল হক

একক ব্যক্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে কার, এ– বিষয়ক কোনো জরিপ কখনো হয়েছে কি? হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নাম ওপরেই থাকবে। গত দেড় হাজার বছরে দেশ-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে অজস্র সাহিত্যিক, সমাজনেতা, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ, গবেষক, রাষ্ট্রনায়ক, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁকে নিয়ে বিপুল প্রশস্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ না করেও তাঁকে মহামানবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ্বের ঘোর দুর্দিনে তাঁর মতো নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। একেবারে আটপৌরে জীবনীগ্রন্থ থেকে বিশেষায়িত গবেষণাগ্রন্থ লিখেছেন তাঁরা অসংখ্য। একটিই মানুষ, একটিই তাঁর জীবন, একটিই কাহিনি– সেই মক্কার কুরাইশ পরিবারে জন্ম, আল-আমিন উপাধি, সিরিয়ায় বাণিজ্য, হেরা পর্বতের ধ্যানমগ্নতা, মক্কার দাওয়াত, তায়েফের ক্ষত, মদিনায় হিজরত, বদরের যুদ্ধ, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বগমন, আবার মক্কায় ফেরা, বিদায় হজ। একই কথা বহুমুখে বহুজনে বহুশতাব্দী ধরে বাতাসে

বাতাসে ফিরছে, তবু যেন অফুরান, যেন কিছু লেখা হলো আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের, কিছু বলা হলো আর অনেক কিছুই হয়নি বলা।

জীবনী রচনার সূচনাপূর্ব

মহানবী (সা)-কে জানার প্রথম উৎস হলো কোরআন। যেমন তাঁর সম্পর্কে তাঁর জীবনসঙ্গী আয়েশা (রা)-এর কাছে জানতে চাওয়ার পর তিনি বলেছেন, কোরআনই তাঁর চরিত্র। (ইমাম বুখারি, আল আদাব আল মুফরাদ, হাদিস: ৩০৮)। কোরআন জুড়ে প্রসঙ্গক্রমে নবী জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির ছায়া পড়েছে। মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, যুদ্ধের নানান অনুষঙ্গ, অথবা নবীর স্ত্রীর নির্দোষিতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে তখনকার ঘটনার আলোকে। কোরআনের প্রাচীন তাফসির ও কোরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট–সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিস এবং হাদিসের বিচ্ছিন্ন সংকলনগুলোতে তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা বিধৃত হয়েছে। সেকালে রচিত ইতিহাসের আধার ও উপাদানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নবী জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ধারাবাহিক জীবনী রচনার উন্মেষ ঘটেছে তাঁর ইন্তেকালের অন্তত ৫০ বছর পরে। কেননা নবীজি তখন নিজেই তাঁদের সামনে ছিলেন। এমনকি দূরে বা কাছের যাঁরা তখনো দেখেননি তাঁকে, তাঁদেরও সবার যেন একবার অন্তত দেখার সুযোগ হয়ে যায়, তাই তিনি বহু আগেই বিদায় হজের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর তিরোধানের পর পরবর্তী প্রজন্মও সাহাবিদের এমন একটি বিরাট দলের সান্নিধ্য পেয়েছেন, যাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সব ইবাদত ও কাজকর্ম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ মেনে বাস্তবায়িত হতো। তারপর সময়ের দূরত্ব যত বাড়তে থাকে, নবীজি সম্পর্কে জানার কৌতূহল বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি কেমন ছিলেন– এই প্রশ্নের আধিক্য মহানবীর জীবনকাহিনি রচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। প্রজন্মান্তরে মহানবীকে দেখা ও তাঁকে জানার প্রবল ইচ্ছার কথা কি তিনিও জানতেন? যেমন তিনি বলেছেন, 'তোমাদের পরে উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি এতটা ভালোবাসাসম্পন্ন লোক আসবে, যারা তাদের সম্পদ-পরিজনের বিনিময়ে হলেও আমাকে দেখতে চাইবে।' (মুসলিম, সহিহ, হাদিস: ২৮৩২)। তো জীবিত সাহাবিগণ নবীজির বিবরণ তুলে ধরা শুরু করলেন, কখনো সংক্ষেপে, কখনো সবিস্তারে, আবার কখনোবা আংশিক। এভাবেই একসময় ধারাবাহিক জীবনী সামনে চলে এল।

জীবনীগ্রন্থের দুটি বাহু

মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনার প্রধানতম দুটি বাহু রয়েছে। একটি হলো 'সিরাত'; যাকে 'সিয়ার' ও 'মাগাজি'ও বলা হয়। সিরাত মানে জীবনী। আমরা মহানবী (সা)-এর জীবনীর যে সাধারণ ধরনটি দেখি, অর্থাৎ জন্ম থেকে তাঁর

জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলির বিবরণ সেটিই 'সিরাত' নামে পরিচিত এবং এ-জাতীয় গ্রন্থকে সাধারণত সিরাতগ্রন্থ বলা হয়। তবে আরেকটা দিক আছে– নবীজির দৈহিক গঠন, আচরণ ও কার্যক্রমের বর্ণনা। একে বলে 'শামায়েল'। শামায়েল রচনার ধারাটা শুরু হয় একটু পরে। শামায়েল গ্রন্থকারকগণ প্রথম দিকে কেবল নবীজির দৈহিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর অবয়ব-প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তৃতি আকারে নবীজির আচার-আচরণ, ইবাদত-বন্দেগি, বিনয়-কোমলতা– এভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সব দিক উল্লেখ করা হতে থাকে। শামায়েল বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো ইমাম তিরমিযীর (মৃ. ২৭৯ হি.) 'শামায়েলে তিরিমিযী', ইমাম বাগাবির (মৃ. ৫১৬ হি.) 'আল আনওয়ার ফিশ শামায়েল', ইবনে কাসিরের (মৃ. ৭৭৪ হি.) 'আল-ফুসুল ফি সিরাতির রসুল' ও জালালুদ্দিন সুয়ুতির (মৃ. ৭৭৪ হি.) 'শামায়িলুশ শারিফা' এবং বর্তমান সময়ে সিরিয়ান লেখক সালেহ আহমাদ শামির (জন্ম ১৯৩৪) 'মিন মায়িনিশ শামায়েল', যা ইতিমধ্যে আকিক পাবলিকেশনস, ঢাকা থেকে 'মুহাম্মাদ স.: ব্যক্তি ও নবী' নামে অনুবাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম যুগের রচনাবলি

প্রথম মহানবী (সা)-এর জীবনী রচনা করেন কে– এই সময়ে এসে তাঁর নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া দুরূহ। ১০৯২ সালে সৌদি আরবের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত 'আসসিরাতুন নাবাবিয়াহ ফি যাওইল মাসাদিরিল আসলিয়া' এ-বিষয়ক একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। ড. মাহদি রিজকুল্লাহ আহমাদ তাতে চৌদ্দ শতকের মিসরীয় স্কলার ইবনে হাজার আসকালানির অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম তিনজন রচয়িতার নাম ও রচনার উল্লেখ করেছেন।

এক. সাহল ইবনে হাসমা (রা)। তাঁর জন্ম তৃতীয় হিজরিতে। কৈশরে তিনি মহানবী (সা)-কে দেখেছেন এবং উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার আমলে (৪১-৬০ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সেই জীবনীর বিভিন্ন অংশ মৌলিক সূত্র আকারে নবম শতকের ঐতিহাসিক বালাযুরি রচিত 'আনসাব', ইবনে সাদ রচিত 'তাবাকাত', তাবারি রচিত 'তারিখে তাবারি' এবং ওয়াকিদির বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়।

দুই. সাইদ ইবনে সাদ ইবনে উবাদা খাজরাজি। তাঁর রচনা ইবনে হাম্বল ও আবি-ইওয়ানার 'মুসনাদ' এবং তাবারির 'তারিখে তাবারি'তে রয়েছে।

তিন. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (মৃ. ৭৮ হিজরি)। খ্যাতিমান তাফসির বিশারদ সাহাবি। হাদিস ও সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর রচনা পাওয়া যায়। তাঁদের

তিনজনের রচিত নবী জীবনী পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না এবং পরবর্তী সময়েও সেই রচনাবলি কোথাও একত্রে সংকলিত হয়নি।

তাঁদের পরে রচনাকর্মে হাত দেন উরওয়া ইবনে জুবাইর (রা) (মৃ. ৯২ হি.), সাদ ইবনে মুসাইয়িব মাখজুমি (মৃ. ৯৪ হি.), আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক (মৃ. ৯৭ হি.) ও খলিফা উসমানের (রা) ছেলে আবান ইবনে উসমান (মৃ.১০৫ হি.), ওয়াহাব ইবনে মুনাববিহ (মৃ. ১১০ হি.), ইবনে শিহাব জুহরি (মৃ. ১২০ হি.), শুরাহবিল ইবনে সাদ (মৃ. ১২৩ হি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর ইবনে হাজাম (মৃ. ১৩৫ হি.)। কিন্তু উরওয়া, ওহাব ও জুহরির রচনা ছাড়া সব কটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিছু কিছু অংশমাত্র বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে টিকে আছে।

উরওয়া ইবনে জুবাইর (রা) ছিলেন সাহাবি আবু বকরের (রা) বড় মেয়ে আসমার ছেলে। তিনি উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ও আল ওয়ালিদের সময়ে নবীযুগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে জানতে চাওয়া চিঠির জবাব লিখতেন। তাঁকে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা)-এর 'প্রথম জীবনীকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের খ্যাতিমান স্কলার ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আজমি (মৃ. ২০১৭ খ্রি.) তাঁর রচিত পুস্তিকাটির কেবল শেষভাগটি উদ্ধার করতে সক্ষম হন– যা আবুল আসওয়াদ মিসরির বর্ণনায় পাওয়া যায় এবং 'মাগাজি রসুলিল্লাহ সা. লি-উরওয়াহ ইবনি জুবাইর বি-রিওয়াতি আবিল আসওয়াদ' শিরোনামে রিয়াদ (সৌদি আরব) থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশ করেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাববিহর রচনার একটি অংশ বর্তমানে জার্মানির হাইডেলবার্গে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। আর ইবনে শিহাব জুহরির রচনা বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কুড়িয়ে এনে ২ হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আওয়াজি এবং তা দুই খণ্ডে 'মারাউইয়্যাত আল ইমাম জুহরি ফিল মাগাজি' শিরোনামে ২০০৪ সালে মদিনা থেকে প্রকাশিত হয়।

সর্বপ্রাচীন পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ

প্রাচীন সিরাত গ্রন্থের কথা উঠলেই সবাই একনামে ইবনে ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) রচিত 'সিরাতে ইবনে ইসহাক'কে চেনেন; যার ভিত্তিতে আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.) জনপ্রিয় সিরাতগ্রন্থ 'সিরাতে ইবনে হিশাম' রচনা করেছেন। অথচ এর অন্তত এক যুগ আগে রচিত হয়েছে মুসা ইবনে উকবার (মৃ. ১৪১ হি.) সুবিশাল সিরাতগ্রন্থ 'আল-মাগাজি' এবং তা এখনো অক্ষত আছে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী 'মুআম্মার ইবনে রাশেদ'র (মৃ. ১৫১ হি.) সিরাতগ্রন্থ

'আল-মাগাজি'ও সিরাতে ইবনে ইসহাকের পূর্বে রচিত এবং তার কপিও দুর্লভ নয়। লেখকদের জীবনকালের তারতম্য থেকেও প্রাচীনত্বের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। ইবনে ইসহাকের জন্ম ৮৫ হিজরি এবং মৃত্যু ১৫১ হিজরি। আর মুসা ইবনে উকবার জন্ম ৬৮ হিজরি এবং মৃত্যু ১৪১ হিজরি। সুতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইবনে ইসহাক রচিত 'সিরাত' নয়– মুসা ইবনে উকবার 'আল-মাগাজি' সর্বপ্রাচীন পূর্ণাঙ্গ সিরাতগ্রন্থ।

গত শতকের প্রথম দিকে জার্মান প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড সাচাউ (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.) বার্লিনে সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকের হাদিসবেত্তা ইউসুফ ইবনে কাজি শাহবাহ (মৃ. ১৩৮৭ খ্রি.) সংকলিত মুসা ইবনে উকবা বর্ণিত হাদিসগুলো ও 'মাগাজি'র ২০টি অধ্যায়– সংবলিত একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং কিছু নির্বাচিত অংশ ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ে প্রথমবারের মতো গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখে। এরপর মরক্কোর ইবনে জুহর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবু মালিক মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বাকিশিশ দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে আরবি মূলপাঠ উদ্ধারে সক্ষম হন, এরপর প্রয়োজনীয় টিকা-ভাষ্য যুক্ত করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক অনুষদ থেকে ১৯৯৪ সালে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা

হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতক ছিল নবীজীবনী রচনার প্রথম যুগ। তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। এই যুগই হলো নবীজীবনী রচনার স্বর্ণযুগ এবং ইতিহাসের ধুলোর আস্তর কঠিন হওয়ার আগেই ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বিরাট বিরাট কলেবরের জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছেন। তৃতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'সিরাতে ইবনে হিশাম', যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ আলফ্রেড গিলিয়াম অনূদিত ইংরেজি সংস্করণ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হলে তা আধুনিক সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরপরই রয়েছে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদির (মৃ. ৩৪৬ হি.) 'আত-তারিখ ওয়াল মাগাজি' গ্রন্থটি। লেখক 'ওয়াকিদি' নামেই সমধিক পরিচিত, তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর এই গ্রন্থটির বিভিন্ন বর্ণনার ব্যাপারে ইসলামবেত্তা পণ্ডিতগণ বেশ 'আপত্তি' তুলেছেন। চতুর্থ হিজরি শতকে রচিত হয় ঐতিহাসিক জারির ইবনে তাবারির (মৃ. ৩১০ হি.) 'আত-তারিখ ওয়াল উমাম' এবং আলী ইবনে হুসাইন মাসউদির (মৃ. ৩৪৬ হি.) 'মুরুজু আজ-জাহাব', পঞ্চম হিজরি শতকে ইবনে হাজমের (মৃ. ৪৫৬ হি.) 'জাওয়ামিউস

সিরাহ', ষষ্ঠ শতকে আবদুর রহমান সুহাইলি আন্দালুসির (মৃ. ৫৮১ হি.) 'রওজুল উনফ', সপ্তম শতকে প্রকাশিত হয় ইমাম নববির (মৃ. ৬৭৬ হি.) 'তাহজিবুস সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ', অষ্টম শতকে তিনটি গ্রন্থ বিখ্যাত হয়– ইমাম জাহাবির (মৃ. ৭৪৮ হি.) 'আল-মাগাজি', ইবনুল কাইয়্যিম জাওজির (মৃ. ৭৫১ হি.) 'জাদুল মাআদ' ও ইবনে কাসিরের (মৃ. ৭৭৪ হি.) 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'। এর মধ্যে 'জাদুল মাআদ' গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ৬ খণ্ডে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নবম হিজরি শতকের দুটি বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থ হলো ঐতিহাসিক আহমদ ইবনে আলী মাকরিজির (মৃ. ৮৪৫ হি.) 'ইমতাউল আসমা বিমা লিররসুলি মিনার আবনা' ও প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা ইবনে হাজার আসকালানির (মৃ. ৮৫২ হি.) 'মুখতাসারুস সিয়ার'; দশম শতকে শিহাবুদ্দিন কাসতালানি (মৃ. ৯২৩ হি.) লেখেন 'আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা', এগারো শতকে রচিত হয় আল্লামা বুরহানুদ্দিন হালাবির (মৃ. ১০৪৪ হি.) বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থ 'ইনসানুল উয়ুন ফি সিরাতিল আমিনিল মামুন', যা 'সিরাতে হালাবিয়া' নামে সমধিক পরিচিত।

এ যুগের রচনার সিংহভাগ রচিত হয়েছে আরবি ভাষায়, যদিও লেখকদের সবাই আরব ছিলেন, তা নয়। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের লেখা ও শেখার মাধ্যম আরবি হওয়ায় রচয়িতাগণ আরবি ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আধুনিক যুগের বিচিত্র রচনা

ইসলামের ইতিহাসের এমন কোনো পণ্ডিত খুঁজে পাওয়া ভার, যিনি নবীজীবনের ওপরে কলম ধরেননি। কারও কারও রচনা কলেবরে এতটাই বিরাট আকার ধারণ করেছে যে তা কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে 'সিরাত বিশ্বকোষ' রচিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ নবীজীবনের ওপর আরবি ভাষায় বিরাট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশাতেও তাঁকে নিয়ে অনেক প্রশস্তিমূলক কাব্য রচিত হয়েছে বটে, তবে তা জীবনী আকারে ছিল না। ১২ হিজরি শতকে মাসউদ ইবনে মুহাম্মাহ আল-ফাসি (মৃ. ১১১৯ হি.) প্রথম কাব্যজীবনী রচনা করেন। গ্রন্থের নাম দেন 'নাফাইসুদ দুরার ফি আখবারি সাইয়িদিল বাশার'। এরপর একইভাবে আহমদ বুখারি দিময়াতি (মৃ. ১৮৯২ ইং) রচিত 'সাআদাতুত দারাইন' এবং ইউসুফ ইসমাইল নাবহানি (মৃ. ১৯৩২ ইং) লেখেন 'আন-নাজমুল বাদি ফি মাওলিদিশি শাফি'। বাংলা ভাষায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মরুভাস্কর' লিখেছেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। মহানবী (সা)-এর জীবনী নিয়ে চারটি পর্বে ১৮টি খণ্ড-কবিতা নিয়ে রচিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক যুগে আরবি ভাষার অন্যতম সিরাতগ্রন্থ হলো নাসিরুদ্দিন আলবানি (মৃ. ১৯৯৯ ইং) রচিত 'সহিহ আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা', ভারতের বিখ্যাত দায়ি আবুল হাসান আলী নদভি (মৃ. ২০০০ ইং) রচিত 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা'; যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ 'নবীয়ে রহমত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। সফিউর রহমান মোবারকপুরির (মৃ. ২০০৬ ইং) 'আর রাহীকুল মাখতুম' আরবি বইটি ১৯৭৯ সালে রাবেতায়ে আলাম আল ইসলামি আয়োজিত প্রথম উন্মুক্ত সিরাত গ্রন্থ প্রতিযোগিতায় ১১৮৭টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এটিকে সিরাত সংক্রান্ত বিশাল সংগ্রহশালার একটি নির্যাসগ্রন্থ বলা যায়। মিসরীয় চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আল গাজালি (মৃ. ১৯৯৬ ইং) রচনা করেন সিরাতবিষয়ক একটি বিশ্লেষণগ্রন্থ 'ফিকহুস সিরাহ'। একই নামে সিরিয়ান শায়খ রামাদান আল-বুতিরও (মৃ. ১৯৯৬ ইং) একটি রচনা রয়েছে। এ ছাড়া আরবি ভাষায় লিখিত সিরাতের মধ্যে সাইয়েদ সোলাইমান নদভির 'আস-সিরাতুন নাবাবিয়া', শায়খ সালেহ আল মুনাজ্জিদ 'খুলুকুন আজিম' ও আলী সাল্লাবির 'আসসিরাতুন নাবাবিয়া আরজু ওয়াকায়ি ওয়া তাহলিলিল আহদাস' উল্লেখযোগ্য।

উর্দু ভাষায় রয়েছে ভারতের শিক্ষাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের 'রসুলে রহমত' ও শিবলী নুমানির 'সিরাতুন নাবী'। ইংরেজি ভাষার আলোচিত সিরাতগ্রন্থগুলোর মধ্যে মার্টিন লিংগসের 'Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources', জামাল বাদাবির 'Muhammad A Blessing For Mankind', ওয়াহিদুদ্দিন খানের 'Prophet of Revolution', হোসাইন হায়কলের 'Muhammad Rasulallah', মোহাম্মদ হামিদুল্লাহর 'Muhammad Rasulullah: A concise survey of the life and work of the founder of Islam', সাইয়েদ হোসাইন নাসেরের 'Muhammad, Man of God', আদিল সালাহির 'Muhammad: man and prophet, a complete study of the life of the Prophet of Islam', ফেতুল্লাহ গুলেনের 'The Messenger of God: Muhammad' ও তারিক রামাদানের 'The Messenger: the Meanings of the Life of Muhammad' উল্লেখযোগ্য।

অমুসলিমদের রচনাবলি

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে প্রাচ্যবিদদের রচনায় বেশ কিছু জীবনীগ্রন্থের নাম উঠে আসে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে মহানবী (সা)-কে উপস্থাপন করার চেয়ে তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে বেশি। ফিলিপ কে হিট্টি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর রচিত 'ইসলাম অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট' গ্রন্থের চতুর্থ

অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'ইসলাম ইন ওয়েস্টার্ন লিটারেচার'। তিনি দেখিয়েছেন, ১৬৪৯ সালে সিউর ডিউ রায়ার কোরআনের ফারসি তরজমা প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে মহানবী (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য যুক্ত করে Alcoran of Mahomet নামে প্রকাশ করেন। এই Mahomet হলো মুহাম্মদ (সা)-এর বিকৃত রূপ। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে একই নামের ৪১টি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর ১৭৩৬ সালে ভলতেয়ার 'মাহোমেত' নামে একটি পাঁচ অঙ্কের প্রহসন রচনা করেন; যার পুরো শিরোনাম: Le fanatisme, ou Mahomet le Prophete (ধর্মান্ধতা বা মাহোমেত নবী)। নাটকের মাহোমেত [মুহাম্মদ (সা)] চরিত্রটি ধর্মান্ধ, যে তাঁর সমালোচকদের হত্যার আদেশ দেয় এবং 'পালমিরা' নামে এক মেয়ের প্রেমে মত্ত হয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেন্ট হেলেনাতে বন্দি থাকাকালে এই নাটকের কঠোর সমালোচনা করেন। ভলতেয়ার তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেন এবং বলেন, 'তিনি [মুহাম্মদ (সা)] অবশ্যই খুব মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি মহান মানুষদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। ছিলেন বিজয়ী বিধানদাতা, প্রজ্ঞাবান ও নেতা। সাধারণ মানুষের চোখে তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন।'

১৮৩০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের একজন পূর্বপুরুষ রেভারেন্ড জর্জ বুশ এ এম (১৭৯৬-১৮৫৯) লেখেন The Life of Mohammed : Founder of the Religion of Islam and of the Empire of the Saracens' । কিসিঞ্জার লিগেছি রিপ্রিন্ট ১৮৩৩ সালে তা পুনঃপ্রকাশ করে এবং নতুন করে ২০০২ সালে লন্ডনে আবার ছাপা হয়। ১৮৪৩ সালে জার্মান প্রাচ্যবিদ গুস্তাফ ওয়েইল লেখেন 'Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre', ১৮৫১ সালে অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ স্প্রেঙ্গার লেখেন 'Aloys Sprenger, The Life of Mohammad, from Original Sources', ১৮৫৮ সালে স্কটিশ লেখক উইলিয়াম মুর ৪ খণ্ডে লিখেছেন 'The Life of Muhammad and History of Islam to the Era of the Hegira'। তবে ১৯৪৭ সালে আর ভি সি বোদলে লিখিত বিখ্যাত 'The Messenger: the Life of Mohammed' গ্রন্থটি বেশ প্রশংসা অর্জন করে, খ্যাতিমান স্কলার আলী নদভিসহ পরবর্তীকালের সিরাত গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থের রেফারেন্স ব্যবহার করেন। এমন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো উইলিয়াম মন্টোগোমেরি ওয়াট রচিত Muhammad at Mecca ও Muhammad at Medina.

উর্দু ভাষায় অমুসলিমদের রচনাবলির মধ্যে বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হলো ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক গুরু দত্ত সিং দারা (G S Dara) লিখিত 'রসুলে আরাবি', যা

আবু তাহের মেছবাহ কর্তৃক 'তোমাকে ভালোবাসি হে নবী' শিরোনামে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আরেকটি হলো স্বামী লক্ষ্মণ প্রসাদ লিখিত 'আরব কা চান্দ'। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে, লেখক একজন হিন্দু সাহিত্যানুরাগী যুবক; সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বাইরে এসে সত্যপ্রিয়তায় প্রণিত হয়ে শেষ নবীর জীবনী লিখেছেন। ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের ফতেহাবাদ জেলার তোহানায় থাকতেন তিনি। ১৯৩৯ সালে ২৬ বছর বয়সে মারা যান। গ্রন্থটি পরে পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় লেখা নবীজীবনী

বাংলা ভাষায় যাঁরা মহানবী (সা)-এর জীবনীগ্রন্থ লেখেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনই ইসলামের অনুসারী নন, তবু ভক্তি ও ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদনে তাঁরা মুসলিমদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। যদিও ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে জনৈক লেখকের 'মহম্মদের বিবরণ' শিরোনামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা ছিল কুৎসায় ভরপুর। তবে বাংলায় প্রথম যাঁর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সামনে আসে, তিনি হলেন রেভারেন্ড জেমস লং। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন খ্রিষ্টান, পরে মুসলিম হন। ১৮৮৫ সালে তা কলকাতার সত্যার্ণব প্রকাশনী থেকে 'মুহাম্মদের জীবনচরিত্র' নামে প্রকাশিত হয়। একই বছর অতুল কৃষ্ণমিত্র লেখেন 'ধর্মবীর মুহাম্মদ' নামে একটি নাট্যজীবনী। ১৮৮৬ সালে কৃষ্ণ কুমার মিত্রের 'মুহাম্মদ চরিত্র ও মুসলমান ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রকাশিত হয় শ্যামা প্রেস, কলকাতা থেকে এবং গিরিশ চন্দ্র সেন লেখেন ৩ খণ্ডে 'মহাপুরুষ মুহাম্মদের জীবনচরিত'। এরপর ১৯০৪ সালে রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন 'হজরত মুহাম্মদ ও হজরত আবু বকর'।

বাংলা সাহিত্যে নবীজিকে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১)। গ্রন্থটির নাম 'হযরত মুহম্মদের স. জীবনচরিত ও ধর্মনীতি', ১৮৮৭ সালে ৪০৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সিরাতগ্রন্থ হলো কলকাতা থেকে ১৯০৮ সালে ডা. সৈয়দ আবুল হোসেন রচিত 'মোসলেম পতাকা', ১৯১৫ সালে কলকাতা থেকে শেখ মোহাম্মদ জমীর উদ্দীন রচিত 'মাসুম মোস্তফা (সা)', ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে এয়াকুব আলী চৌধুরী রচিত 'মানব মুকুট', ১৯২৫ সালে মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীর নগরী রচিত 'নবীশ্রেষ্ঠ', ১৯২৫ সালে কলকাতা থেকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরু ভাস্কর', ১৯৪২ সালে চুঁচুড়া থেকে কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী', ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ রচিত 'শেষ নবী', ১৯৫১ সালে ঢাকা থেকে মাওলানা আবদুল খালেক রচিত দুই খণ্ডের

'ছাইয়েদুল মুরছালীন', ঢাকা থেকে ১৯৬০ সালে মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'নবী গৃহ সংবাদ', ১৯৬৮ সালে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন রচিত 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন'। এ ছাড়া কবি আল মাহমুদ রচিত 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)', কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা রচিত 'মহানবী' ও ২০০২ সালে প্রকাশিত কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত 'বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)' অনন্য জীবনীগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষক নাসির হেলাল তাঁর গবেষণায় মধ্যযুগ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় রচিত মোট ১০২৮টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।

নারীদের সিরাত রচনা

মহানবী (সা)-এর জীবনীগ্রন্থ রচনার কাজটি ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে পুরুষদের হাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। তবে আধুনিক সময়ে বেশ কয়েকজন নারীর লিখিত গ্রন্থ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবার ওপরে থাকবেন ক্যারেন আর্মস্ট্রং। তিনি ইংল্যান্ডের ওয়ারসেস্টারশায়ারের উইল্ডমুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন গির্জার নান। ১৯৯১ সালে তাঁর 'Muhammad: A Biography of the Prophet' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের যেসব ঘটনা নিয়ে পশ্চিমাদের সমালোচনা ছিল, সেগুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে তাদের সমাজের উপমা উল্লেখ করেন। ২০০৬ সালে 'Muhammad: A Prophet For Our Time' নামে আরও একটি ননফিকশন গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তবে এর আগে ১৯৪২ সালে দ্য শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'Aishah: the beloved of Mohammed'। এই গ্রন্থের লেখক নাবিয়া অ্যাবট ছিলেন আমেরিকার একজন প্যাপিওরোলজিস্ট ও পুস্তিকাবিদ। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে প্রথম মহিলা অধ্যাপক নির্বাচিত হন। আরবি লিপি ও ইসলামের প্রাচীনতম লিখিত দলিলগুলোর উত্থানের বিষয়ে তাঁর গবেষণার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। মুহাম্মদ (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে লেখা হলেও এটি মূলত একটি সিরাতগ্রন্থ, যাতে হিজরতের পূর্ব থেকে আয়েশা (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসও সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় প্রভাবশালী জার্মান প্রাচ্যবিদ অ্যানেমারি শিমেলের ৩৬৭ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ। শিরোনাম 'And Muhammad Is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety'। লেখক

দীর্ঘদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ২০১৩ সালে ব্রিটিশ লেখক লেসলি হাজলেটন (জন্ম ১৯৪৫) রচিত 'The First Muslim: The Story of Muhammad' নিউইয়র্ক টাইমস এডিটর্স বাছাইয়ে নির্বাচিত হয় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০১৬ সালে ফরাসি লেখক হেলা ওয়ার্দি মহানবী (সা)-এর জীবনের শেষের দিনগুলো নিয়ে রচনা করেন 'Les Derniers Jours De Muhammad' গ্রন্থটি, যা ইতিমধ্যে 'মুহাম্মাদ ফি আইয়্যামিল আখিরাহ' শিরোনামে আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় নারী সিরাতগ্রন্থকারদের মধ্যে প্রথমে জায়গা করে নিয়েছেন সারা তাইফুর (জ. ১৮৯৩)। তাঁর লিখিত 'স্বর্গের জ্যোতি' গ্রন্থটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৩৭১ বাংলা সনে বাংলা একাডেমি এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। তাঁর পুরো নাম হুরায়ুন্নিসা সারা খাতুন। কাব্যিক গদ্যে রচিত এ গ্রন্থের ভাষা সাবলীল। লেখিকা অত্যন্ত দরদ দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি দিয়ে লেখিকাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এরপর খাদিজা আক্তার রেজায়ি লেখেন 'তিনি চাঁদের চেয়েও সুন্দর'। তিনি 'আর-রাহিকুল মাখতুম'র মতো কয়েকটি প্রাচীন ও মৌলিক সিরাতগ্রন্থ অনুবাদের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। ২০০৯ সালে মাসুদা সুলতানা রুমির সিরাতগ্রন্থ 'আমি বারোমাস তোমায় ভালোবাসি' প্রকাশিত হয় ঢাকার রিমঝিম প্রকাশনী থেকে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে প্রবাসী লেখিকা মাজিদা রিফার 'মহানবী' প্রকাশিত হয় রাহবার প্রকাশনী, ঢাকা থেকে। অসাধারণ গদ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সবিশেষ– হাজার বছর ধরে মহানবীর জীবনী রচনার যে অবিরল ধারা চলেছে, তা নিশ্চয় মহাকাল পর্যন্ত রুদ্ধ হওয়ার নয়। কবি যথার্থ বলেছেন, শব্দশিল্পী সকল কালের সকল দেশের সব ভাষার, আহরণ করে সকল মুক্তা মনের মাধুরী করে উজাড়, অনন্তকাল রচে যায় যদি বাণীর হার, তোমার স্তুতি তবুও হে নবী হবে না শেষ।♦

লেখক: ইসলাম ধর্ম বিষয়ের গবেষক
সৌজন্যে : দৈনিক প্রথম আলো

বাগদাদে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর মাজার শরীফের মিনার

পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম

শিক্ষায় বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর অবদান

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার

সূফি ইতিহাসে বড়পীর খ্যাত হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) ৪৭০ হিজরীর ১ রমযান তৎকালীন আব্বাসিয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ থেকে চারশত মাইল দূরে পারস্যের তাবারিস্তানের জিলান নগরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (র) এবং সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসা জঙ্গি (র) ছিলেন যথাক্রমে তাঁর মাতা ও পিতা। তৎকালীন সময়ে জ্ঞানের শহর বাগদাদে শিক্ষা জীবন শুরু করার আগে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অবশ্যই তার বাল্যশিক্ষার হাতে খড়ি হয় নিজ গৃহে গুণবতী মা ও জ্ঞানবান পিতার নিকটে। তার মা হযরত ফাতেমা (র) ছিলেন ১৮ পারার কুরআনের হাফেজা। ফলে তিনি খুব সহজে মায়ের নিকট থেকে আল-কুরআনের পাঠ শিখে নেন। বাল্যশিক্ষা শেষ করে গৃহ শিক্ষকের নিকট পড়া শুরু করার আগেই তিনি ১৮ পারা আল-কুরআন হেফজ করেন। এক্ষেত্রে তার মা হযরত ফাতেমা (র) শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। পিতার নিকটও তিনি জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। পিতা ও মাতার নিকট ওই শিক্ষা গ্রহণ পরবর্তী জীবনে তাকে একজন উদার ও মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পিতা-মাতার নিকট বাল্য শিক্ষা শেষে তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট জ্ঞানের নানা বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি বাড়ির পাশে অবস্থিত স্থানীয় মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার গভীর ধীশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিরল মেধা তাকে অল্প সময়ে অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। ওই গুণগুলোর কারণে তিনি বাল্যকালেই খুব সহজে শিক্ষক ও সহপাঠীদের নজর কাড়তে সক্ষম হন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি গুণীজনদের স্নেহশীল পাত্রে পরিণত হন। তার পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকায় তাকে বাল্যকালে অন্নসংস্থানের জন্য চিন্তা করতে হয়নি। তিনি একনিষ্ঠ মনে পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান। কিন্তু আকস্মিক তাঁর পিতা আবু সালেহ (র)-এর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার অর্থকষ্টে পড়ে। পরিবারে একমাত্র বৃদ্ধ মা ছাড়া অন্য কোনো সদস্য না থাকায় সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কিশোর আবদুল কাদেরের উপর অর্পিত হয়। ফলে তিনি তাঁর পিতার রেখে যাওয়া জায়গা-জমি চাষ, ফলের বাগান ও গবাদি পশুর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেন। সাংসারিক কাজে মনোযোগী হওয়ায় তাঁর পক্ষে দৈনন্দিন বিদ্যাচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জ্ঞানের প্রতি গভীর টান থাকায় কিশোর আবদুল কাদেরের এই সাংসারিক জীবন ভালো লাগেনি। তার মন আশা-নিরাশা ও সিদ্ধান্তহীনতার দ্বন্দ্বে জ্বলতে থাকে। জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে আবারও নিযুক্ত করার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে পড়েন। তার এই উন্মুখততার কথা তিনি তার বৃদ্ধ মা ফাতেমাকে (র) জানান। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের কথা এবং পুত্রের বয়স চিন্তা করে প্রাথমিকভাবে মা ফাতেমা

আবদুল কাদেরকে পুনরায় পূর্ণকালীন জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করার অনুমতি দিতে চাননি।

মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে কিশোর আবদুল কাদের মনের বেদনা গোপন রেখে সন্তুষ্টচিত্তে সাংসারিক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করার পর তার মনের অবস্থা আরো খারাপ হয়। জ্ঞানসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত না করতে পারার বেদনা তাকে অস্থির করে তোলে। তার বয়স যখন ১৮ বছর পূর্ণ হয় তখন একদিন তিনি মাঠে গরু চরানোর সময়েই তার এই বর্তমান সাংসারিক দায়িত্ব ত্যাগ করে পূর্ণকালীন শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। এক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন সময়ের জ্ঞানবিজ্ঞানের বাতিঘর খ্যাত বাগদাদ নগরীতে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন। শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাগদাদ নগরীতে যাওয়ার ওই সংকল্পের কথা তিনি তার মা ফাতেমাকেও (র) অবহিত করেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর বাড়ি থেকে বাগদাদের দূরত্ব ছিল প্রায় চারশত মাইল এবং তার মা ফাতেমার (র)-এর বয়স তখন ৭৮ বছর। কিন্তু পুত্রের ওই দৃঢ় সংকল্পের কথা অবহিত হয়ে, জ্ঞান সাধনার প্রতি পুত্রের গভীর টান দেখে এবং সদ্য যৌবনে পা রাখা আবদুল কাদেরের বয়স বিবেচনা করে মা ফাতেমা (র) এবার আর আপত্তি করেননি। তিনি পুত্র আবদুল কাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করেন এবং সানন্দচিত্তে শিক্ষাগ্রহণের জন্য বাড়ি ত্যাগ করে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

তৎকালীন সময়ে জিলান নগর থেকে বাগদাদ যাওয়া সহজ পথ ছিল না। পদব্রজে কোনো কাফেলার সাথে দুর্গম সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে জিলান নগরের মানুষ বাগদাদ নগরে যেতেন। একা যাওয়া অসম্ভব ছিল বিধায় বাগদাদগামী কাফেলা ধরার জন্য তাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হত। তাই মায়ের নিকট থেকে অনুমতি পাওয়ার পর তরুন আবদুল কাদের বাগদাদগামী কাফেলার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। ভাগ্যসুপ্রন্ন হওয়ায় তিনি অচিরেই বাগদাদগামী একটি কাফেলার সন্ধান পান এবং উক্ত কাফেলার লোকদের সাথে তিনি বাগদাদ যেতে চান বলে প্রস্তাব করলে যাত্রীদল আবদুল কাদেরকেও তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হন। বাড়ি ফিরে তিনি ওই সুসংবাদ মা ফাতেমাকে (র) জানান। চারশত মাইলের দূরত্ব, বিপদসঙ্কুল পথ ও নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য সম্পর্কে হযরত ফাতেমা (র) অবহিত থাকা সত্ত্বেও পুত্রের জ্ঞান অর্জনের প্রবল ইচ্ছার কাছে হার মেনে পুত্রের বাগদাদ যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন।

বাগদাদে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর মাজার শরীফ

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর পিতা সালেহ (র) মৃত্যুকালে আশিটি স্বর্ণমুদ্রা প্রিয়তম স্ত্রী ফাতেমার (র) নিকট সংরক্ষিত রাখেন। সংসারে নানা অভাব অনটনের সময়েও ওই স্বর্ণমুদ্রা এতদিন হযরত ফাতেমা (র) খরচ করেননি। এবার তিনি ওই স্বর্ণমুদ্রা থেকে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা পুত্রের হাতে দেন। তৎকালীন সময়ে জিলান ও বাগদাদের মধ্যবর্তী যাত্রপথে ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হযরত ফাতেমা (র) এই বিষয়টি জানতেন। তাই তিনি স্বর্ণমূদ্রাগুলো যাতে তার তরুণ পুত্র আবদুল কাদের ডাকাতের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে সেই জন্য আবদুল কাদেরের বগলের নিচে জামার আস্তিনের মধ্যে এমনভাবে সেলাই করে দিলেন যে বাহির থেকে দেখে কারোর বোঝার উপায় নেই যে আবদুল কাদেরের নিকট চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। যাত্রাকালে মা ফাতেমা (র) পুত্র আবদুল কাদেরকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা উপদেশ প্রদান করেন। ওই সব উপদেশের মধ্যে চরম বিপদের সময়ও সত্য কথা বলার উপদেশ অন্যতম ছিল। সত্যবাদী হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি পুত্রকে অবহিত করেন। মা ফাতেমার (র) ওই উপদেশ পুত্র আবদুল কাদের সব সময় মনে রেখেছেন এবং আমৃত্যু সর্বদা পালনের চেষ্টা করেছেন। বাগদাদ যাত্রায় মরু ভূমিতে দলদল নামক স্থানে তার কাফেলা ডাকাতের দল আক্রমণ করলে তিনি ডাকাত সর্দারের প্রশ্নের মুখে মায়ের উপদেশ মেনে সত্য কথা বলেন সেই ঘটনা তার বড় প্রমাণ। ডাকাত

সর্দারের প্রশ্নের মুখে তিনি তার কাছে থাকা চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রার কথা অকপটে স্বীকার করেন। ওই সত্য কথা বলার ফলও তিনি হাতেনাতে পান। ডাকাত সর্দার তার দলবলসহ তওবা করে ডাকাতি পরিত্যাগ করে ভালো মানুষ হয়ে যান।

বাগদাদ পৌঁছে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) তৎকালীন সময়ের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ওই মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র, ফিকাহ, সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। জগৎশ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রখর ধী-শক্তি, বিরল মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে অচিরেই ওই সব শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্রে পরিণত হন। পড়াশুনায় অধিক মনোযোগের কারণে তাকে অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হতো। তৎকালীন বাগদাদ নগরীতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তার পক্ষে পড়াশুনার পাশাপাশি কাজ বা উদার মানুষদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা লাভও সম্ভব হয়নি। আর্থিক দুঃসময়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটানোর মধ্যে একদিন জিলানবাসী এক সফরকারীর মাধ্যমে তার মায়ের পাঠানো ৭টি স্বর্ণমুদ্রা পান। উদার হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) নিজের আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওই স্বর্ণমুদ্রা থেকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আগন্তুকের পথের খরচ হিসেবে প্রদান করে মাত্র দুটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের কাছে রাখেন।

তিনি অর্থের চেয়ে জ্ঞানার্জনকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। ছাত্র জীবনে অধিক অর্থ জ্ঞান অর্জনের পথে বাঁধা হতে পারে সেই বিষয়টি তিনি ভালোভাবে বুঝতেন বলেই সর্বদা কষ্টের জীবনকে বেছে নিয়েছেন। অর্থ উপার্জনের বদলে জ্ঞান অর্জন ছিল তার জীবনের সাধণা। তাই দুঃখ, কষ্ট ও দৈন্যতায় পতিত হয়েও চূড়ান্ত ফলাফলে তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদের অধিকারী হন। পবিত্র আল-কুরআন, হাদীস, তাফসির, ফিকাহ, দর্শন, ভূগোল, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রসায়ণ ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি বুৎপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন সময়ের উপর্যুক্ত বিষয়ে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এর সমকক্ষ অন্য কোনো পণ্ডিত ছিলেন না বললেই চলে। তার ওই বিরল প্রতিভা তৎকালীন বিশ্বে তাকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে। শিক্ষাগ্রহণ শেষে উচ্চপদে চাকরির নানা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হলেও শিক্ষকতা শুরু করেন তৎকালীন সময়ের আরও একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কাদেরিয়া মাদ্রাসায়। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর শিক্ষক শায়খ মুবারক (র) ছিলেন ওই কাদেরিয়া

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তারপক্ষে কাদেরিয়া মাদ্রাসা উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কাদেরিয়া মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ও অবকাঠামো বাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার খ্যাতিমান ছাত্র হযরত আবদুল কাদের জিলানীকে (র) তার মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) শায়খ মুবারকের (র) আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সানন্দচিত্তে কাদেরিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ওই মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের দুইবেলা শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি সকালে ফজরের নামাজ পড়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান শুরু করতেন। যোহরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত ওই পাঠদান চলত। ওই সময়ে তিনি শিক্ষার্থীদের হাদীস, ন্যায়বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, উসুল ও সাহিত্য এবং ব্যাকরণের পাঠ দিতেন। যোহরের নামাজ পড়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ ও হালকা বিশ্রাম শেষে তিনি পুনরায় শিক্ষার্থীদের এশা পর্যন্ত পাঠ দান করতেন। ওই সময়ে তিনি শিক্ষার্থীদের আল-কুরআন, অনুবাদ শাস্ত্র, ফিকাহ ও তৌহিদ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এর মতো তার ছাত্ররাও অগাধ পাণ্ডিত্য, মহাৎ চরিত্র ও অনুসন্ধিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ খাতেয়ানী (র), হযরত আলী ইবনে আবু বকর ইবনে ইদ্রিস (র), হযরত আবু মোহাম্মদ আবুল হাসান জাবারী (র) প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) অল্প সময়ে শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তার খ্যাতি এত বিস্তৃত হয় যে অচিরেই বাগদাদে অবস্থিত ও শায়খ মুবারক (র) প্রতিষ্ঠিত ওই মাদ্রাসাটি তার প্রতিষ্ঠাকালীন নামের বদলে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) নামে কাদেরিয়া মাদ্রাসা হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠে। এশিয়া, ইউরোপ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে দলে দলে ছাত্ররা তার নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্য কাদেরিয়া মাদ্রাসায় ভিড় জমায়। নতুন নতুন শিক্ষার্থীর আগমনের ফলে মাদ্রাসার গৃহ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে দরছ গ্রহণ করা ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ছাত্ররা খোলামাঠ, অলিতেগলিতে দাঁড়িয়ে, বৃক্ষছায়া ও বাসগৃহের উপর বসে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর পাঠ গ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় কাদেরিয়া মাদ্রাসার পরিসর বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ শায়খ মুবারকের (র) পক্ষে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা অসম্ভব ছিল বিধায় হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) শিক্ষকতার পাশাপাশি কাদেরিয়া মাদ্রাসার অবকাঠামো নির্মাণেও মনোযোগী হন। তিনি মাদ্রাসার সম্প্রসারণের জন্য সঙ্গতিসম্পন্ন ও শিক্ষাপ্রাণ

মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাদের নিকট মাদ্রাসার সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখার আহবান জানান। খ্যাতিমান শিক্ষক হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এর আহবানে দলে দলে মানুষ সাড়া দেয়। অনেকে আর্থিকভাবে আবার কেউ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসার সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখেন। নারীরাও এই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যুক্ত হন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে কাদেরিয়া মাদ্রাসার জায়গা ও অবকাঠামো সমস্যার সমাধান হয়।

চারদিকে যখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি নিজ জন্মভূমি জিলানে ফিরে যাওয়ার মনস্থির করেন। তার ওই বাগদাদ ত্যাগ করে জিলানী ফিরে যাওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে বাগদাদবাসী রাস্তায় নেমে আসে। তারা কোনোভাবেই হযরত আবদুল কাদের জিলানীকে (র) বাগদাদ ত্যাগ করতে দিতে রাজি ছিল না। অন্যদিকে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) এর শিক্ষক শায়খ মুবারকও তার প্রিয় ছাত্রকে ত্যাগ করতে রাজি নয়। ফলে তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানীকে (র) বাগদাদ ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। শিক্ষকের এই আদেশ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। ফলে তারপক্ষে আর বাগদাদ ত্যাগ করে জিলানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এভাবে তিনি বাগদাদের সাথে আমৃত্য তার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেন।

অবশেষে ৯১ বছর বয়সে ১১ রবিউস সানী ৫৬১ হিজরীতে এই বাগদাদ নগরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না। ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরুও। সেই কারণে তাকে সূফিদের উস্তাদ বলা হয়। তার ছাত্রদের পাশাপাশি সূফিরাও তাকে সমানভাবে সম্মান করতেন। তাই তার মৃত্যুর দিনকে সারাবিশ্বের সূফিরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন। তার মৃত্যুবার্ষিকী 'ফাতেহা-ই-ইযাজদাহাম' হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হলেও সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তিনি বড়পীর হিসেবে সমধিক শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ও সূফিরা ছাড়াও সব তরিকার মুসলিমরা বড়পীরের মৃত্যু দিবসকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করেন। প্রতি বছর সারা বিশ্বে গুরুত্ব দিয়ে পালিত হয় 'ফাতেহা-ই-ইযাজদাহাম'।♦

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
salah.sakender@outlook.com

জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতা

মিলন সব্যসাচী

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মানব সভ্যতার ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হামলা চালিয়ে ঘাতকচক্র জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হঠাৎ এ শোকবাহী সংবাদ বেদনার্ত বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় জীবনে নেমে আসে দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণার ঝড়। তখন অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমেদ ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দি ছিলেন।

তাঁর সহকারি বন্দি ছিলেন 'দ্য পিঁপল পত্রিকার এডিটর আবিদুর রহমান। দু'জনই দু'টি কক্ষে ফাঁসির আসামীর মতো জীবন কাটিয়েছেন। কারাবন্দি অবস্থায় তারা জাতীয় চার নেতা হত্যার সংবাদ পান। কারাগারের সবাই এবং কারারক্ষীরা সতর্ক। ময়মনসিংহ কারাগারের জেল সুপার ছিলেন শ্রী নির্মলেন্দু রায়। অসাধারণ মানুষ তিনি। কারাগারে যারা বন্দি তাদের প্রত্যেকের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও মানবিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাকে খুব স্নেহ করতেন। বঙ্গবন্ধু যখন বারবার করাবরণ করেছিলেন, নির্মলেন্দু রায় তখন খুব কাছে থেকে তাকে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নির্মলেন্দু রায়কে কাছে টেনে অনেক আদর করতেন। সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ নির্মলেন্দু রায় তোফায়েল আহমেদের সেলে এসে বললেন– 'ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তোফায়েল আহমেদ প্রশ্ন করলেন এতো রাতে কেন? তিনি বললেন, 'ঢাকা কারাগারে আপনার প্রিয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা কারাগারের চতুর্দিক পুলিশ দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছি জেল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এস.পি সাহেব এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে। তখন তোফায়েল আহমেদ বললেন 'না' এভাবে তো যাওয়ার নিয়ম নাই। আমাকে যদি হত্যাও করা হয় আমি এখান থেকে এভাবে যাব না। পরবর্তীতে জানা যায় সেনাবাহিনীর একজন মেজর সেদিন কারাগারে প্রবেশের চেষ্টা করে। নির্মলেন্দু রায় তাকে বলেছিলেন, 'আমি অস্ত্র নিয়ে কাউকে কারাগারে প্রবেশ করতে দেব না।' কারাগারের চতুর্পার্শে তোফায়েল আহমেদকে রক্ষা করার জন্য সেদিন যারা ডিউটি করছিলেন তাদের মধ্যে তোফায়েল আহমেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ওদুদ সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নির্মলেন্দু রায়ের নিকট তোফায়েল আহমেদ তার ঋণের কথা 'আমার স্মৃতিতে জাতীয় চার নেতা' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। জেলখানার এই নির্মম নিষ্ঠুর হত্যার খবরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অতীতের কথাই ভাবতে শুরু করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি জাতীয় চার নেতাকে নিবিড়ভাবে দেখেছেন। তাঁদের আদর স্নেহ আর রাজনৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে তার জীবন ধন্য হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে যখন জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, তোফায়েল আহমেদসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনেক নির্ভীক সৈনিক নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জাতীয় চার নেতাসহ তোফায়েল আহমেদও বন্দি ছিলেন।

১৫ আগস্টের পরদিন তোফায়েল আহমদের বাসভবনে খুনিচক্র এসে তাকে তুলে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যায়। সেখানে তোফায়েল আহমেদের উপর বর্ণনাতীত অত্যাচার করা হয়। পরবর্তীতে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং তোফায়েল

আহমদের বিশ্বস্ত বন্ধু কর্নেল শাফায়েত জামিল তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তোফায়েল আহমেদকে রেডিও স্টেশন থেকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ২২ আগস্ট জাতীর চার নেতাসহ তোফায়েল আহমেদের মত আরো বেশ ক'জন বরেণ্য নেতাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছিল গুলি করে হত্যা করার জন্য। যে কোন কারণেই হোক না কেন অবশেষে তাদের হত্যা করেনি। পরে নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা উপেক্ষা করেও তারা খুনি মোশতাকের সার্বিক প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গৃহবন্দি অবস্থা থেকে জিল্লুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাককে একই দিনে গ্রেফতার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কোণে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ৬ দিন বন্দি রেখে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। তারপর তোফায়েল আহমেদ ও আবিদুর রহমানকে ময়মনসিংহ কারাগারে এবং জিল্লুর রহমান ও প্রিয় নেতা আবদুর রাজ্জাককে কুমিল্লা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঙালি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতীয় চার নেতার সমুজ্জ্বল স্মৃতি আজও অম্লান। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা ঘোষণা করেন তাজউদ্দীন আহমেদ তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ৬ দফা ঘোষণার পর মার্চের ১৮,১৯ ও ২০ তারিখে হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু মানুষ চিনতে বিন্দু মাত্র ভুল করতেন না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু যোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে বসাতে ভুল করেনি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রথম সভাপতি, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী সাহেবকে অন্যতম সভাপতি, এএইচএম কামরুজ্জামান সাহেবকে নিখীল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক করেছিলেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাংলাদেশে ৬ দফা সমর্থনে জনসভা করেন। তখন তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই গ্রেফতার হতেন। কিন্ত আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে থমকে দিতে ব্যর্থ হন।

১৯৭১ সালে ৮ মার্চে নারায়নগঞ্জের জনসভা শেষে ধানমন্ডি বাসভবনে ফেরার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর তাজউদ্দীন আহমদসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। ৭ জুন এর প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে এক বিশাল জনসমুদ্রে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বহুমাত্রিক দিক বিশ্লেষণসহ বর্ণনা তুলে ধরেন। তাজউদ্দীন আহমদ একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন এবং এএইচএম কামরুজ্জামন পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদের এমএনএ হিসেবে পার্লামেন্টে বাঙালির

পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। মূলত আওয়ামী লীগের এই জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বারংবার ঐতিহাসিক দক্ষতার সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদসহ অধিকাংশ নেতাই কারাগারে বন্ধি ছিলেন। তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাইরে ছিলেন। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে মরহুম আহমেদুল কবীরের বাসভবনে DAC এর সভা হচ্ছিলো। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামের পক্ষ থেকে তোফায়েল আহমদ ১১ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি নেতৃবৃন্দের কাছে যখন ১১ দফা দাবী ব্যাখ্যা করেন, তখন ন্যাপ নেতা মাহমুদুল হক কাসুরি ছিলেন, 'You included Sheikh Mujib's six points into, so questions of acceptance dose not come'. তার এই বক্তব্যের পর তোফায়েল আহমেদ বলছিলেন,'আমরা বাঙালি কিভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় আমরা জানি। আপনারা সমর্থন না করলেও এই ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্ত করবো। 'এই দৃপ্ত উচ্চারণের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম তোফায়েল আহমেদকে বুকে টেনে আদর করে বলেছিলেন 'তোমার বক্তব্যে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।' মহৎ হৃদয়ের অধীকারি নেতৃবৃন্দের যার যা প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু তাদের তা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণমুখি পর্যালোচনায় জানা যায়, তিনি তৃণমূলের কার্মীদের নেতা বানিয়েছেন। ইউনিয়নের নেতাকে থানার নেতা, থানার নেতাকে জেলার নেতা, জেলার নেতাকে কেন্দ্রের নেতা এবং কেন্দ্রীয় নেতাকে জাতীয় নেতা বানিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজে হয়েছিলেন জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধুর কাছে কর্মীদের যোগ্যতা দক্ষতা ও কাজের মূল্য ছিল। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং এএইচএম কামরুজ্জামান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সরকার গঠন করলে কে কোন পদে পদায়িত হবেন মুজিবুর রহমান তা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তোফায়েল আহমদ এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপনেতা, ইউসুফ আলী চিফ হুইপ, আবদুল মান্নান এবং আমিরুল ইসলাম-হুইফ নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক পরিষদ নেতা নির্বাচিত হন মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হবেন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী। এ জন্য মনসুর আলীকে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পূর্ণ বঙ্গবন্ধু এভাবেই সেটআপ দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে ১২ মার্চে পূর্বঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত হলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা পর্ব। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে সর্বাত্মক স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। সমগ্র বিশ্ববাসী কখনও এমন অসহযোগ আন্দোলন দেখেনি কেউ। বঙ্গবন্ধু জাতীয় চার নেতার নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন অসযোগের প্রতিটি দিন। এ সময় লালমাটিয়ার প্রয়াত নেতা খুলনার মোহসীন সাহেবের বাসভবনে বসে নেতৃবৃন্দ সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন জাতীয় চার নেতার সাথে পরামর্শ করে। মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা ছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে কে কোথায় কী কাজ করবেন, এটি আগেই নির্ধারিত করে রাখতেন। ২৫ মার্চ রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার পর যখন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। তখন জাতীয় চার নেতাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দক্ষতার সাথে মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করেন। মুজিবনগর সরকারে বঙ্গবন্ধু নেই, কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন বিষয়কমন্ত্রী কামরুজ্জামান সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশকে হানাদার মুক্ত করেন। অনেকেই স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করার মহোৎসব আত্মহারা হয়ে ওঠেন। অথচ বঙ্গবন্ধু অনেক ত্যাগ শিকার করে বাংলাদেশটা স্বাধীন করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমেদসহ শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাককে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ ৬৭৭ বাসভবনে ডাকেন। উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন- 'পড়ো, মুখস্ত করো। সবাই মুখস্থ করলো একটি ঠিকানা' ২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা।' বলেছিলেন,'এখানেই হবে তোমাদের জায়গা। ভূট্টো, ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ক্ষমতা দেবে না। আমি নিশ্চিত ওরা আক্রমণ করবে। আক্রমণ হলে এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করবে।' বঙ্গবন্ধু সব ববস্থা করে রেখেছিলেন।

সদ্য নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সুতারকে আগেই কলকাতায় প্রেরণ করেছিলেন। ডাক্তার আবু হেনা প্রাদেশিক সদস্য তাকেও বঙ্গবন্ধু আগেই পাঠিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে। যে পথে আবু হেনা গিয়েছিলেন। এই একই পথে তিনি ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান,

শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সবাই রাজেন্দ্র রোডে অবস্থান করতেন। জাতীয় চার নেতা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থান করতেন। নেতৃবৃন্দের সাথে তোফায়েল আহমেদ নিয়মিত যোগাযোগ করতেন। বহুবার তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে তোফায়েল আহমেদ বর্ডারে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছিলন। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায় মুজিব বাহিনীর সাথে মুজিবনগর সরকারের ভুল বোঝাবুঝির চেষ্টা হয়েছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সকল ভুল বোঝাবুঝি দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর তোফায়েল আহমেদ এবং আবদুর রাজ্জাক ১৮ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসেন। জাতীয় চার নেতৃবৃন্দ ২২ ডিসেম্বর ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। ২২ ডিসেম্বর সবাই বিমানবন্দরে মুজিবনগর সরকারের জাতীয় চার নেতাকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমেদের বাসভবনে বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি সর্বদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাবেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিল্পমন্ত্রী থাকবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী হবেন, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী যোগাযোগমন্ত্রী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান থাকবেন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। তোফায়েল আহমেদের সৌভাগ্য হয়েছিল ১৪ জানুয়ারি থেকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হওয়ার। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তোফায়েল আহমেদ মন্ত্রীর পদমর্যাদা পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যেই ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খুনিচক্র বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যা করে। জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতার আজীবনের আরাধ্য স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে প্রিয় বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করা। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহান নেতাদের সেই স্বপ্ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ককরতে সক্ষম হলেই নেতৃবৃন্দের বিদেহী আত্মা চিরশান্তি পাবে। জয় হোক জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলার, বাস্তাবায়িত হোক জাতীয় চার নেতার স্বপ্ন-সাধ।♦

দেশমাতৃকায় নিবেদিত প্রাণ

শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান

মো. আশরাফুল ইসলাম

বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিভাবান ও নিবেদিতপ্রাণ লোকান্তরিত ব্যক্তি স্ব-স্ব অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এককালের বরেন্দ্রভূমির মধ্যমণি একালের বৃহত্তর রাজশাহী জেলা। ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী জেলায় বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী, সমাজহিতৈষী ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁদের মধ্যে এএইচএম কামরুজ্জামান অন্যতম। তিনি শুধু রাজশাহীবাসীর গর্ব নন; বরং তিনি হলেন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি জাতীয় চার নেতার গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম একজন জাতীয় নেতা হিসেবে জনগণের নিকট সমাদৃত হন। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা এএইচএম কামরুজ্জামান প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে রাজনীতির অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন নির্লোভ, সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে সমস্ত দেশজুড়ে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন হাজার

বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে কয়জনকে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী ভেবেছিলেন জনাব এএইচএম কামরুজ্জামান ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য কাজ করে গেছেন, দিয়েছেন নিজের জীবনও।

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

১৯২৩ সালের ২৬ জুন বর্তমান নাটোর জেলার অন্তর্গত বাগাতিপাড়ার মালঞ্চী রেলস্টেশন সংলগ্ন নূরপুর গ্রামে মামার বাড়িতে এএইচএম কামরুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি রাজশাহী জেলার কাদিরগঞ্জ মহল্লায়। অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং বনেদি জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। পূর্ববাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে জাড়িয়ে আছে এ পরিবার। ফলে জাতীয় এই নেতা জন্মসূত্রেই উদার, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধসম্পন্ন পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজেকে বিকশিত করেন।

তাঁর পুরো নাম আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, সংক্ষেপে এএইচএম কামরুজ্জামান। তাঁর ডাকনাম হেনা। দাদি আদর করে তাঁকে এ নামে ডাকতেন। পরবর্তীতে রাজশাহীবাসীর কাছে তিনি সর্বজনীন ও শ্রদ্ধেয় 'হেনা ভাই' নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল হামিদ ও মাতার নাম বেগম জেবুন্নিসা। পিতা আব্দুল হামিদ (১৮৮৭-১৯৭৬ খ্রি.) রাজশাহীর একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যও ছিলেন। আট ভাই ও চার বোনের মধ্যে কামরুজ্জামান ছিলেন প্রথম।

কামরুজ্জামানের লেখাপড়ার শুরু রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত তাঁর ফুপা রাজশাহী থেকে চট্টগ্রামে বদলী হয়ে যাবার সময় তাঁকেও সাথে করে নিয়ে যান এবং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখান থেকেই ১৯৪২ সালে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতা যান এবং বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এল ডিগ্রি লাভ করে রাজশাহীতে আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

কামরুজ্জামান ছিলেন অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। মেট্রিকুলেশন ও আই.এ পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করায় মেধাবী ছাত্র হিসেবেই তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। গৌরবমণ্ডিত এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও অধ্যয়নের সুবাদে তিনি তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব অতিবাহিত করেন। একই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। এসময় বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। অন্যদিকে কামরুজ্জামান তখন প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলা শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে কামরুজ্জামানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতায়। একবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্রলীগ ফেডারেশনের কাউন্সিলের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য তুমূল হট্টগোল হয়েছিল। সেই সময় একজন যুবক হলরুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। সেই যুবকটি বঙ্গবন্ধুর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন,

> "এই সময় হলের উপর তলার বারান্দায় বাইরের ছাত্ররা অনেকে এসেছে, তারা দর্শক। একজন ছাত্র হাফপ্যান্ট পরা চীৎকার করে বলছে, 'আমি জানি এরা অনেকেই ছাত্র না, বাইরের লোক। শাহ আজিজ দল বড় করার জন্য এদের এনেছে।' পরে খবর নিয়ে জানলাম ছেলেটির নাম কামরুজ্জামান। পরে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা পরিষদের সদস্য হয়েছিল।"

ধারণা করা হয়, সেটাই ছিল ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এএইচএম কামরুজ্জামানের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীপন্থী মুসলিম ছাত্রলীগের দুই তরুণ ছাত্রনেতা ছিলেন তাঁরা। তাঁদের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্র সম্ভবত আরো বিলম্বেই ঘটেছিল।

এএইচএম কামরুজ্জামান ১৯৫১ সালে জাহানারা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার চামরুল গ্রামের আশরাফউদ্দিন তালুকদারের মেয়ে। আশরাফ উদ্দিন তালুকদার ঐ অঞ্চলের জোতদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ৬ সন্তানের পিতা

হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বড় ছেলে এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন (জন্ম ১৯৫৯ খ্রি.) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একজন সফল মেয়র এবং বাবার আদর্শে লালিত। তিনি ২০০৮ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়ে একজন সৎ ও বিশ্বস্ত জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। মেজো ছেলে এএইচএম এহসানুজ্জামান স্বপন (জন্ম ১৯৬১ খ্রি.) একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকুরীরত। মেয়েদের নাম ফেরদৌস মমতাজ পলি (জন্ম ১৯৫৩ খ্রি.), দিলারা জুম্মা রিয়া (জন্ম ১৯৫৫ খ্রি.), রওশন আক্তার রুমী (জন্ম ১৯৫৭ খ্রি.) ও কবিতা সুলতানা চুমকি (জন্ম ১৯৬৪ খ্রি.)। জাতীয় নেতা এএইচএম কামারুজ্জামানের সহধর্মিণী জাহানারা বেগম ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন!

মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালীন রাজনৈতিক ভূমিকা

কামরুজ্জামান ছিলেন পারিবারিকভাবে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি চমৎকার এক রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি এবং যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজশাহীর সরদার পরিবার যুক্ত ছিল বরাবরই। তাঁর দাদা হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার (১৮৪৮-১৯৩৬ খ্রি.) কংগ্রেস রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এ কারণে কংগ্রেস ও প্রথম সারির মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হাজী লাল মোহাম্মদ দুবার অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (এম.এল.সি) নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতদ্ব্যতিত তিনি রাজশাহী এসোসিয়েশন ও বরেন্দ্র একাডেমীর একমাত্র মুসলিম সদস্য হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কামরুজ্জামানের পিতাও মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন রাজশাহী অঞ্চলের মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশ ও পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। এরূপ রাজনীতি সচেতন বংশে জন্মগ্রহণ করায় রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া কামরুজ্জামানের জন্য স্বাভাবিক ছিল। ফলে উক্ত বংশের যোগ্য সন্তান হিসেবে কামারুজ্জামান বাংলার মানুষের মুক্তিসংগ্রামে ধীরে ধীরে অনন্য উচ্চতায় উঠে আসেন এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য করেন।

১৯৭১ সালে মুক্ত সাতক্ষীরায় মুজিব নগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান

অতি অল্প বয়সেই কামরুজ্জামান রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। অতঃপর ১৯৪৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলীম ছাত্রলীগের নির্বাচিত সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে ১৯৫৭ সালে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এই সময় কামরুজ্জামান প্রবল শক্তি নিয়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তিনি দুবার মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৬৭ সালে তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা নির্বাচিত হন। এসময় তিনি পাকিস্তানের আইন পরিষদে উন্নয়ন ভাবনা ও গণতান্ত্রিক চর্চার কথা বলেছেন। পাশাপাশি তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংযোগ রেখেছেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ-এর নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি এবং ৬ দফা দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গে গণআন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আইয়ুব সরকারের দমনপীড়ন ও নির্যাতনের মাত্রাও ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এমতাবস্থায় ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি অভিন্ন ঐক্য গড়ে

তুলে কামরুজ্জামান দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সঠিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। ১৯৬৯ সালে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ঘনীভূত হলে ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এমএনএ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর এ বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

কামরুজ্জামান ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পুনরায় তিনি রাজশাহী থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে সারা দেশে এক অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল। এসময় শেখ মুজিব ৫ সদস্য বিশিষ্ট দলীয় হাই কমান্ড গঠন করেন। এই হাই কমান্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন কামরুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা হিসাবে তিনি ১৯৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ও সবশেষে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন কোন নির্বাচনেই তিনি পরাজিত হননি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্যের বিষয়ে সর্বদা তিনি সোচ্চার ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগের আহবায়ক এবং ১৯৭০ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের সক্রিয় ৫ হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জাতীয় নেতা কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন যে,

> "পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ৬ দফা ও ১১ দফা প্রত্যাখ্যান করলে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করা হবে।"

এছাড়া ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ কারফিউ প্রত্যাহারের জন্য তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দেন এবং ১১ মার্চ রাজশাহীর ভুবনমোহন পার্কে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা দেন যে, 'স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।' এই সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের টেপও বাজানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখছেন এএইচএম কামরুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক অবদান

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকচক্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বেআইনিভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এছাড়াও ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণকার্যে সরকারের অনীহা প্রভৃতি কারণে বাঙালিদের মনে অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে। ফলে শেখ মুজিবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকিস্তান সরকার নিরীহ-নীরস্ত্র বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়, যা ইতিহাসে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ন্যায়-নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতা মূলক যুদ্ধ শুরু করলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারলেসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই কুখ্যাত গণহত্যার সময়-ই পাকিস্তানী বাহিনী শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি এর পূর্বেই তার দলের নেতা-কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলেছিলেন। নেতার এরূপ নির্দেশে এএইচএম কামারুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আরও কয়েকজন নেতা বগুড়া হয়ে কলকাতা চলে যান। সেখানে তাঁর সাথে তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতাকর্মীর দেখা হয়। একই স্থানে তাঁরা সকলে মিলে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় প্রথম অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার মুক্তাঞ্চলে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হন। তাঁরা সেখানে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন ও বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করা হয়। এছাড়াও খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অপরদিকে জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী অস্থায়ী সরকারের মুক্তিবাহিনীর প্রধান কমান্ডার এবং মেজর জেনারেল আবদুর রব চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন।

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয়। ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দেশবাসীর উদ্দেশে বেতারে ভাষণ দেন, যা আকাশবাণী থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়। তাজউদ্দিনের ভাষণের মধ্য দিয়েই দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। এরই পথপরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল সকালে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা বৈদ্যনাথ তলায় সাদামাটা পরিবেশে একটি আমবাগানে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। আমবাগানের চারদিকে রাইফেল হাতে কড়া প্রহরায় ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। চৌকি পেতে তৈরি করা হয়েছিল শপথ মঞ্চ। মঞ্চের উপর সাজানো ছিল ছয়টি চেয়ার। খোলা আকাশের নীচে তৈরি করা হয়েছিল মঞ্চ। এ অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এই অস্থায়ী সরকারের অধীনেই দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথগ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরের দিন দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদ মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল শপথগ্রহণের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়। বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হিসেবে এই দিনটির তাৎপর্য অত্যধিক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় নেতাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মুজিবনগরে অন্যান্য জাতীয় নেতাদের সাথে এএইচএম কামরুজ্জামানও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। নবগঠিত মুজিবনগর সরকার তাঁর উপর সে সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন বিধায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল, শরণার্থী শিবির ও সীমান্ত এলাকায় গিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে নিরীহ বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার-নির্যাতনের কঠোর সমালোচনা করতেন। যেমন-

জাতীয় নেতা এএইচএম কামারুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় সাংবাদিকদের নিকট দীপ্তকণ্ঠে বলেন,

> "নিরীহ বাঙালিদের যারা হত্যা করেছে, এইসব জল্লাদদের সঙ্গে এবং আমাদের অর্থনীতিকে যারা শোষণ করেছে, তাদের সঙ্গে একই ঘরে একত্রে বাসের পরিকল্পনা বাংলাদেশের কারো মনেই স্থান পেতে পারে না।"

১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিক ও ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযানের পরও বাংলাদেশের সাধারণ অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে গৃহমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান বলেন,

> "পাক সৈন্যদের নির্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন, গণহত্যা প্রভৃতি সত্ত্বেও যতই ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী, সে মুক্তাঞ্চলের হোক আর পাক সৈন্যদের দখলীকৃত এলাকারই হোক, মাতৃভূমি এবং নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনে সকলেই আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত।"

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এএইচএম কামরুজ্জামান সহ জাতীয় চার নেতার অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন,

> "ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখব, স্বাধীনতা ঘোষণার পর যখন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন এই জাতীয় চার নেতাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার পরিচালনা করেন ও বিজয় ছিনিয়ে আনেন।"

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কামরুজ্জামানসহ মন্ত্রীবর্গের অন্যান্য সদস্যরা যখন দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, তখন মন্ত্রিপরিষদের আরেক সদস্য খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের পক্ষে ষড়যন্ত্র করছিলেন। এ কারণে একপর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যাতে কোন ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে, সে জন্য তাকে দায়িত্ব পালনে বিরত রাখা হয়। তার পরিবর্তে বিদেশে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। যে কারণে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অবদান

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২২ ডিসেম্বর এএইচএম কামারুজ্জামান অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রীবর্গসহ স্বাধীন দেশে ফেরত আসেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে বাংলাদেশ সরকার পুনর্গঠন করা হয়।

বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন,

> "দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭১-এর ২২ ডিসেম্বর জাতীয় চার নেতা ফিরে এলেন। আর ৯ মাস ১৪ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়ে বিজয়ের পরিপূর্ণতায় জাতির পিতা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের ২২ তারিখ শত্রুমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকারের নেতাদের তথা জাতীয় চার নেতাকে আমরা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাই।"

১৯৭২-এর ১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবনে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা বিষয়ে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং, সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, তাজউদ্দীন আহমদ অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী, এম মনসুর আলী যোগাযোগমন্ত্রী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। এএইচএম

কামরুজ্জামান সেই পুনর্গঠিত সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি রাজশাহীর দুটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি তিনি মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। কেননা ১৯৭৪ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা দলের পদে থাকতে পারবেন না। ফলে বঙ্গবন্ধু দলীয় সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। আর দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন জাতীয় নেতা এএইচএম কামরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন জিল্লুর রহমান। কামরুজ্জামান দলীয় গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দলীয় সভাপতির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকেও কোনরূপ অবৈধ সম্পদের লোভ-লালসা তাঁর মনে সৃষ্টি হয়নি। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন,

> "দীর্ঘদিন এমএনএ, এমপি ও মন্ত্রী থাকলেও কোন অবৈধ সম্পদের মালিক তিনি হননি। তাঁর ত্যাগ ও মহত্ত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান দিয়েই বঙ্গবন্ধু তাঁকে সভাপতি অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উত্তর কাণ্ডারী বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি কখনোই কোন নির্বাচনে পরাজিত হননি। আওয়ামী রাজনীতিতে যোগদানের পর কামরুজ্জামান দলীয় হাইকমান্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কিংবা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার কোন ব্যত্যয় ঘটাননি। কখনো কোন বিতর্কে নিজেকে জড়াননি। তিনি নির্মোহ একজন দেশ-দরদি নেতা ছিলেন।"

১৯৭৫ সালের নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি শিল্প মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ গঠন করে তাঁকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

আপোষহীন নেতা কামরুজ্জামান

এএইচএম কামরুজ্জামান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন নির্ভীক, সুযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সৈনিক ও বন্ধু। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে দেশি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। এসময় মীরজাফর খন্দকার মোশতাক আহমেদের অবৈধ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় কামরুজ্জামান সহ বঙ্গবন্ধুর চার বিশ্বস্ত

অনুসারীকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। কারাবন্দি থাকাকালীন তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। এ সম্পর্কে বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন,

> "আগস্টের ২২ তারিখ জাতীয় চার নেতাসহ আমাদের অনেক বরেণ্য নেতাকে গ্রেপ্তার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল হত্যা করার জন্য। যেকোনো কারণেই হোক ঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত হত্যা করেনি। পরে নেতাদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।"

মিথ্যা মামলায় কারাগারে বন্দি থাকাকালীন সময় একবার এএইচএম কামরুজ্জামানের আপন দুই ছোট ভাই জনাব এএইচএম হাসানুজ্জামান (ইতি) এবং এএইচএম সাইদুজ্জামান (চুনু) তার সাথে দেখা করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> "ভাই তোমার যেন কোন কষ্ট না হয়। আমাদের বঙ্গবন্ধুকে ওরা ছেড়ে দেয়নি তোমাকে আমরা হারাতে পারব না।"

প্রতিউত্তরে জাতীয় নেতা কামরুজ্জামান বলেছিলেন,

> "অনেক রকম আপোষমূলক প্রস্তাব পাচ্ছি, তবে এর কোনটাই আমাকে গলাতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুর রক্তের ওপর পা দিয়ে আমি প্রতারণা করতে পারব না।"

কামরুজ্জামানসহ জাতীয় চার নেতা অবৈধ সরকারের সাথে কোনরূপ নীতি বিসর্জন দিয়ে আপোষ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে সংঘটিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। কারাগারে আটক থাকাবস্থায় সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে জাতীয় অপর তিন নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ কামরুজ্জামানও শাহাদাত বরণ করেন। জেলখানার ভেতর তাঁদেরকে গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

জাতীয় নেতা এএইচএম কামরুজ্জামানের সহধর্মিণী জাহানারা কামরুজ্জামান জেলহত্যার পরবর্তী ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

> "... কফিনে রাখা মুখটা খুলতেই চমকে উঠলাম। কালো, কেমন যেন সবুজ হয়ে গেছে চেহারা। মুখটা বেশ ফুলে গেছে। ডান কপালে গুলির ফুটো। মাথার পিছনে কী অবস্থা দেখিনি। পায়ের হাঁটু কোনরকমে ঝুলে আছে। সেখানেও গুলিতে ঝাঝরা। তাই কালো কম্বল ভাজ করে বুকে জড়ানো। ভাবলাম, আহা লোকটাতো খুব নরম ছিল। ওর জন্য একটা গুলিই তো যথেষ্ট ছিল। ... আর্মি পাহাড়ায় লাশ দাফন

করা হলো কাদিরগঞ্জ পারিবারিক গোরস্থানে। এখনো সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করে। কাউকে বলতে পারি না, নিজেই কষ্ট পাই। ... দুঃখ একটাই গায়ে একটু পানিও ঢালা হলো না। একটু পানি দিলে শান্তি পেতাম।"

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়, কামরুজ্জামানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম ছিল এবং বিশেষ করে ডান দিকের পাঁজরে ও ডান হাতের কনুইতে বড় রকমের ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার আরাধ্য স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে প্রিয় দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সৎ ও দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতা এএইচএম কামরুজ্জামান আজন্ম জনগণের অধিকার আদায়ে লড়াই করে গেছেন। রাজশাহীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তিনি অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন নেতা। যিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। এজন্য জাতীয় নেতা কামরুজ্জামান শুধু রাজশাহীবাসীর গর্ব নন; বরং তিনি ছিলেন পুরো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের আস্থার প্রতীক। শহীদ হওয়ার ৪৫ বছর পরও জাতীয় নেতা এএইচএম কামারুজ্জামান প্রতিটি বাঙালি হৃদয়ে আজও জীবিত আছেন। মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল ব্যক্তি নিজের জীবনকে উজাড় করে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের সকলকে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু স্থান দান করুন।♦

লেখক : এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সং | বি | ধা | ন | দি | ব | স

জাতীয় জীবনে ৪ নভেম্বর

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

আমরা বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়ভাবে কতকগুলি দিবস পালন করে থাকি। এর মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস', ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস', ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস অন্যতম। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ৭ মার্চ-কে 'ঐতিহাসিক' দিবস হিসেবে পালন করার। এছাড়াও জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ঘোষিত ভিন্ন দিবস পালন করা হয়ে যাকে। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ৪ নভেম্বর কেটে যায় নিরবে-কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান 'সংবিধান বিল' হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। '৪৭-এ দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সাংবিধানিক ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লাগাতার সংগ্রাম করেছে। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বপোরি নয় মাসের একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, মা-বোনদের সম্ভ্রম বিসর্জনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিল।

সংবিধানে স্বাক্ষর করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সংবিধান তৈরিতে সময় লেগেছিল প্রায় আট বছর। ঐ সংবিধান তৈরির পর পরেই অব্যাহত সামরিক শাসন মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি জংলি-বর্বর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, যেখানে সাংবিধানিক এবং আইনের শাসন ছিল অনুপস্থিত। ২২ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক Constitutent Assembly of Bangladesh Order, 1972 জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির ঐ আদেশ বলে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ গণপরিষদ'। গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০৪ জন। বহিস্কৃত ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী সদস্যরা গণপরিষদের সদস্য পদ লাভে অযোগ্য ছিলেন।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে ১০ এপ্রিল, ১৯৭২। গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ-এর সভাপতিত্বে গণপরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রথমে নিজেই নিজের শপথ বাক্য পাঠ করেন এবং পরবর্তীতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের শপথ পাঠ করান। একই অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামের সমর্থনে শাহ আব্দুল হামিদ (এন.ই-৫,

রংপুর) স্পিকার ও তাজউদ্দিন আহমেদের প্রস্তাবে এবং মনসুর আলীর সমর্থনে মুহাম্মদুল্লাহ (পি.ই-২৭৫, নোয়াখালী) ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

পরদিন ১১ এপ্রিল '৭২ গণপরিষদের অধিবেশনে মনসুর আলী বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে 'গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত খসড়া প্রণয়ন কমিটি– যার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. কামাল হোসেন'- প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ১০ জুন, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে কমিটি বিল আকারে একটি খসড়া শাসনতন্ত্রসহ রিপোর্ট পেশ করার কথা থাকলেও কমিটির পক্ষে সভাপতি ড. কামাল হোসেন ১২ অক্টোবর ১৯৭২ 'সংবিধান বিল' গণপরিষদে উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু এ উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, 'দুনিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় না, দশ মাসের মধ্যে কোন দেশ শাসনতন্ত্র দিতে পেরেছে। আমি নিশ্চই মোবারকবাদ জানাব শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্যদেরকে। মোবারকবাদ জানাব বাংলার জনসাধারণকে। রক্তে লেখা এই শাসনতন্ত্র। যাঁরা আজ অন্য কথা বলেন বা চিন্তা করেন, তাঁদের বোঝা উচিত যে, এ শাসনতন্ত্র আলোচনা আজ থেকে শুরু হয় নাই। অনেকে যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদের জন্মের আগের থেকে তা শুরু হয়েছে এবং এ জন্য অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের আলোচনা হতে হতে শাসনতন্ত্র কী হবে তার উপরে ভোটের মাধ্যমে, শতকরা ৯৮ জন লোক তাঁদের ভোট আওয়ামীলীগকে দিয়েছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার অধিকার আওয়ামীলীগের রয়েছে। . . . । শাসনতন্ত্র ছাড়া কোন দেশ- তার অর্থ হল মাঝি বিহীন নৌকা, হাল বিহীন নৌকা। শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকার থাকবে, শাসনতন্ত্রে মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও থাকবে। এখানে Free style democracy চলতে পারে না। শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকবে, কর্তব্যও থাকবে। এবং যতদূর সম্ভব, যে শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়েছে, সেটা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং সে আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। জাতীয়তাবাদ-বাঙালি জাতীয়তাবাদ- এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলবে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির রক্ত দিয়ে বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, জনসাধারণের ভোটের অধিকার বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষক-শ্রেণী আর কোনদিন দেশের মানুষকে শোষণ করতে পারবে না।. . . . । আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। .

. . .। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার শাসনতন্ত্র তৈরি হবে। এটা জনগণ চায়, জনগণ এটা বিশ্বাস করে। জনগণ এই জন্য সংগ্রাম করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এই জন্য জীবন দিয়েছে। এই আদর্শ নিয়েই বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠবে'।

সংবিধান বিল উত্থাপিত হওয়ার পর সর্বমোট ১৭টি অধিবেশনে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাবসহ বিলটির উপর আলোচনার পর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সংবিধান বিল গৃহীত হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, 'জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাস বোধ হয় এই প্রথম যে বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে। বোধ হয় না-সত্যিই এই প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন। . . . . । এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্ত এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। . . . . .। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি, জনগণ এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেন এবং করেছেন। .....। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। . . . । শাসনতন্ত্র এমন একটা জিনিস, যার মধ্যে একটা আদর্শ, নীতি থাকে। সেই শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আইন করতে হয়।. . . .। এই মৌলিক আইন বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না।. . . . . । এটা জনতার শাসনতন্ত্র।. . ..। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহীদের রক্তদান সার্থক হবে'।

বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী করা হয় এবং ঐ দিনটিকে ঠিক করা হয় সংবিধানে সদস্যদের স্বাক্ষর দানের জন্য। সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হবে সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'জনাব স্পিকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি, সেইদিন, যেদিন জল্লাদ বাহিনী রেসকোর্স-ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রের মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই তারিখ। সেই ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকর করা হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পিকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা রাখতে চাই'।

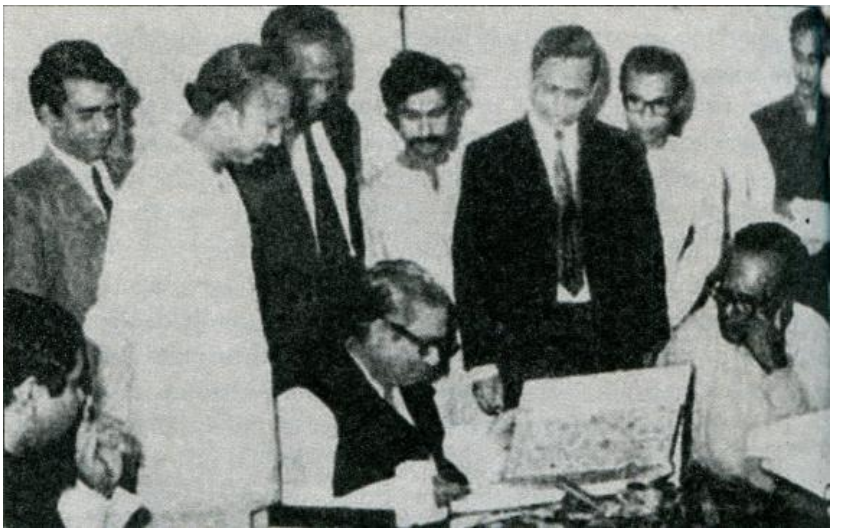

বঙ্গবন্ধুকে হাতে লেখা সংবিধানের কপি দেখাচ্ছেন
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, শিল্পী হাশেম খানসহ অন্যারা

১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধানে গণপরিষদ সদস্যদের স্বাক্ষর দান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ স্পীকারের আমন্ত্রণে সংবিধানে সর্বপ্রথম স্বাক্ষর প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– প্রথমে সংবিধানের বাংলা এবং পরে ইংরেজী পাঠে। ১৫ তারিখ অনুষ্ঠানের শেষ সময় পর্যন্ত ৪ জন মাননীয় সদস্য- শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, শ্রী সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত, মোহাম্মদ আজিজার রহমান এবং মোহাম্মদ ইব্রাহীম সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। স্পিকার সাহেব অনুপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর দানের জন্য 'শেষ বারের' মত নাম ধরে আহ্বান জানালে বঙ্গবন্ধু স্পিকারকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন, 'আর যদি কেউ দস্তখত করার জন্য আসতে না পেরে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি পরেও তাঁদের দস্তখত নিতে পারেন। . . . .। সেজন্য 'শেষবারের মতো' বললে কিছুটা অসুবিধা হয়। সেটা আপনার রুলিং হয়ে যায়। তাই আশা করি, আপনার রুলিং আপনি প্রত্যাহার করে আমার অনুরোধ মেনে নেবেন। প্রতি উত্তরে মাননীয় স্পিকার বলেছিলেন, 'এই পরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বক্তব্য আমি অনুধাবন করলাম'।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাত বারোটায় গণপরিষদের বিলুপ্তি ঘটে এবং রাত বারোটার পর অর্থ্যাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান কার্যকর হয়। গণপরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া উপলক্ষে বিদায়ী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'গণপরিষদের সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁরা

দেশবাসীকে শাসনতন্ত্র দিয়েছেন এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শাসনতন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন'।

দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রাম ও যুদ্ধের পেক্ষাপটে রচিত সংবিধান এর প্রস্তাবনার প্রথম স্তবক– 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; এবং প্রস্তাবনার শেষ স্তবক 'এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদ, অদ্য তেরশত উনষাট বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখ আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম'।

আমাদের সংবিধান- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি অনন্য রাজনৈতিক দলিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে রকমারী বল্লমের অজস্র খোঁচায়। চেষ্টা করা হয়েছে সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূল চরিত্র পাল্টে দেয়ার। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগ বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন রায় প্রদানের মাধ্যমে সচেষ্ট থেকেছে এবং আছে সংবিধানের মূল চরিত্র ও কাঠামোকে রক্ষা করতে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সরকার ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকায় '৭২-এর সংবিধানে বহুলাংশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত, লালন ও বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন সংবিধানের সঠিক চর্চা ও লালন। আর সে লক্ষ্যেই ৪ নভেম্বর দিনটি জাতীয় ভাবে পালিত হতে পারে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত (২৬ নভেম্বর), চীন (৪ ডিসেম্বর), ডেনমার্ক (৫ জুন), নরওয়ে (১৭ মে), কাজাকিস্তান (৩১ আগস্ট), পোল্যান্ড (৩ মে), জাপান (৩ মার্চ), যুক্তরাষ্ট্র (১৭ সেপ্টেম্বর), কানাডা (১ জুলাই), জার্মানী (২৩ মে), বেলজিয়াম (২১ জুলাই), নেদারল্যান্ড (১৫ ডিসেম্বর), অষ্ট্রেলিয়া (৯ জুলাই), আর্জেন্টিনা (১ মে), ব্রাজিল (১৫ নভেম্বর), রাশিয়া (১২ ডিসেম্বর) সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সংবিধান গৃহীত বা কার্যকর হ'য়ার দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' (Constitution Day) হিসেবে বিভিন্ন আংগিকে পালন করে থাকে। কোন কোন দেশে 'সংবিধান দিবস'-এ সরকারী ছুটি পালিত হয়। ৪৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে বটে, কিন্তু 'সংবিধান দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি।♦

লেখক : বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, বাংলাদেশ।

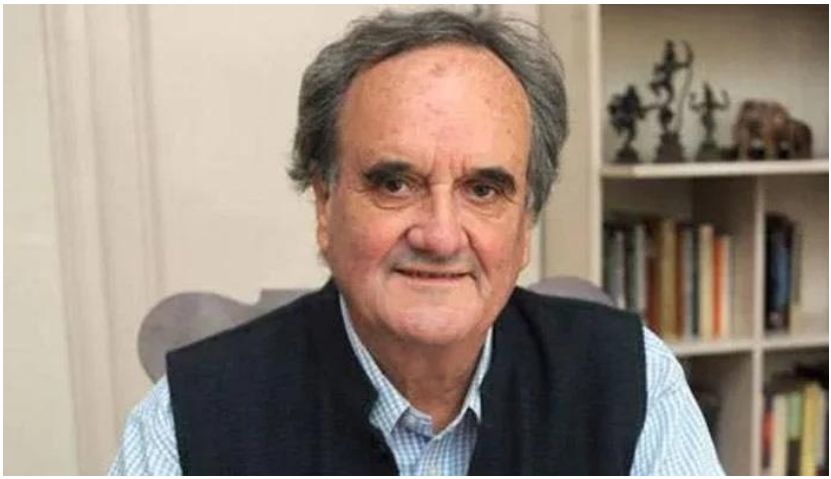

মার্ক টালি

বাংলাদেশ : ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে শক্তিশালী অর্থনীতিতে

স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি

ভাষান্তর : শাখাওয়াত হোসাইন ও সাবিক সিকান্দার

বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব মার্ক টালি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর সাংবাদিকতা কিংবদন্তিতুল্য। বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবেও সারাবিশ্বে মার্ক টালি খ্যাতিমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এই খ্যাতিমান সাংবাদিককেও স্পর্শ করেছে। তিনি ২৪ অক্টোবর ভারতের প্রভাবশালী ‘দি হিন্দুস্তান টাইমস’-এ “বাংলাদেশ : ফ্রম এ ‘বাস্কেট কেইস’ টু এ রোভাস্ট ইকোনমি’ শিরোনামে একটি কলাম লিখেছেন। অগ্রপথিক-এর পাঠকদের জন্য মার্ক টালি’র কলামটির অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে- সম্পাদক

Hindustan Times

india cities opinion world HTLS 2020 ipl entertainment trending videos tech lifestyle bihar election podcasts web stories •••

ADVERTISEMENT

Home / Columns / Bangladesh: From a 'basket case' to a robust economy

Bangladesh: From a 'basket case' to a robust economy

The International Monetary Fund's (IMF) projection that Bangladesh's per capita income in dollar terms is likely to overtake India's has focused attention on a nation that has risen like a Phoenix from the ashes.

COLUMNS Updated: Oct 24, 2020, 19:22 IST

Mark Tully

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina in New York, 2018(REUTERS)

The International Monetary Fund's (IMF) projection that Bangladesh's per capita income in dollar terms is likely to overtake India's has focused attention on a nation that has risen like a Phoenix from the ashes. The ashes were left by the Pakistan army's scorched earth strategy. Travelling in East Pakistan after the army crackdown in 1971, I saw this close up. On the road from Dhaka to Rajshai in the extreme west of the nation, villages were burnt to cinders by the

'দি হিন্দুস্তান টাইমস'-এ "বাংলাদেশ : ফ্রম এ 'বাস্কেট কেইস' টু এ রোভাস্ট ইকোনমি' শিরোনামে মার্ক টালির কলাম

ডলারের হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় প্রতিবেশী দেশ ভারতের মাথাপিছু আয়কে অতিক্রম করতে চলেছে বলে ধারণা করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। আর এ ঘটনা এমন একটি জাতির কথা জানান দেয় যারা ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো মাথাচাড়া দিয়েছে।

পাকিস্তানের ধ্বংসলীলা সে দেশের মাটিতে যেন সবকিছু ছাই করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দখল নেওয়ার এক সফরে আমি তা খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেখানে ঢাকা থেকে দেশের একেবারে পশ্চিমে রাজশাহীর পথে যেতে দেখেছি, গ্রামবাসীদের পুড়িয়ে কয়লা করা হয়েছে। গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে এই আগুন ছড়িয়েছিল রাজধানী ঢাকা থেকে।

স্বাধীনতার আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশিরা দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হলো। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো। একই সঙ্গে সেনা কর্মকর্তারা ক্ষমতা দখলে একে অপরের সঙ্গে লড়াই শুরু করলো। এই মহা চ্যালেঞ্জিং সময়ে যোগ হলো বন্যা ও সাইক্লোনের ভয়াবহতা। নতুন এই জাতি আন্তর্জাতিকভাবেও হেয়-প্রতিপন্ন হতে থাকলো। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সেক্রেটারি অব দ্যা স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিগত ২০ বছর ধরে সেই বাংলাদেশ অর্থনীতি ভারসাম্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই দেশ বেশ কয়েকটি উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছে 'উন্নয়নের মডেল' এর উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

তবে এখন পর্যন্ত দেশটির ২০ শতাংশ মানুষ অতিদরিদ্র। এর অর্থনীতি কমদামি টেক্সটাইল পণ্য এবং বিভিন্ন দেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে, করোনাভাইরসের মহামারিতে এ বছর রেমিট্যান্স প্রায় ২০ শতাংশ কমে আসবে। তাছাড়া টেক্সটাইল শিল্প চরমভাবে প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে এবং অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে।

তবে দুটো বিষয় বাংলাদেশকে আজকের এই অবস্থায় থাকতে সহায়তা করেছে। আর দুটো বিষয়ই ভারতের থেকে ভিন্ন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তা নেওয়ার সদিচ্ছা এবং তাদের সঙ্গে খাপ খায় এমন পরামর্শ গ্রহণ করা। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে বাইরের সহায়তা গ্রহণের প্রতি আমি নিজেও আগ্রহী ছিলাম না। আমার কাছে যৌক্তিক মনে হতো, বিদেশি সহায়তার লভ্যতা বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পদ্ধতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন দৃষ্টি দিলে মনে হয়, বাংলাদেশের অকূল-পাথারে পড়া অর্থনীতি বাংলাদেশের সরকারকে রাজনীতি পাশে রেখে দাতাদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের শক্ত ঐতিহ্য বিরাজমান থাকা এবং বেসরকারিকরণ দারিদ্র-বিরোধী বিবেচিত হওয়ার ভয় থাকা

সত্ত্বেও ঢাকা স্পষ্টভাবেই বেসরকারিকরণ নীতির দিকে গেছে। কিন্তু ভারত এই নীতির বাস্তবায়নে অনেক বেশি সিদ্ধান্তহীনতায় ছিল।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওগুলোকে কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যা ভারতে সেভাবে করা হয়নি। এর একটি অনবদ্য উদাহরণ বহুমুখী উন্নয়নে সম্পৃক্ত একটি এজেন্সি 'বিল্ডিং রিসোর্সেস অ্যাক্রস কমিউনিটিস' বা (ব্র্যাক)।

দ্যা ইকোনমিস্টের মতে, ব্র্যাক এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ চ্যারিটি। এর কার্যক্রম মানুষের অতি দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে নিরীক্ষণমূলক পথ সৃষ্টি করে এবং এ পদ্ধতি বিশ্বের ৪৫টি দেশের এনজিওগুলো অনুসরণ করছে।

এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ভারতের কাছে সব বিকিয়ে দেওয়ার অভিযোগগুলোকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করেছে। তাছাড়া তিনি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দুটো দেশকেই নানা ধরনের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তুলেছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোদি দুই দেশের সীমারেখা নির্ধারণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছেন। দু'দেশের রেল ও বাস যোগাযোগ অনেক এগিয়েছে। এছাড়াও আগরতলা এবং বাংলাদেশের আখাউড়ার মধ্যকার ১২ কিলোমিটার রেলসংযোগ স্থাপনের কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে করে বাংলাদেশ হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাংশের যোগাযোগ অনেক সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। কিন্তু দু'দেশের এই পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হতে পারে, যদি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ক্যাম্পেইনগুলোতে প্রার্থীদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও আপত্তিকর বক্তৃতা কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের কাছে সম্মানহানীকর বলে মনে হয়।♦

ভাষান্তর : শাখাওয়াত হোসাইন, নিজস্ব প্রতিবেদক, কালের কণ্ঠ এবং সাবিক সিকান্দার, জেষ্ঠ্য সহ-সম্পাদক, কালের কণ্ঠ।

(https://www.hindustantimes.com/columns/bangladesh-from-a-basket-case-to-a-robust-economy/story-ba1yqsVMSsTDOeSHEw6voN.html?fbclid=IwAR0M1npVtrzoHLEX9ae9WgpmvWLnrXf2rW7cT2a5fhDt06pMIt_Tw_jDawo)

সাক্ষাৎকার : তোয়াব খান

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন ছায়াটা সরে যায় তখনই অভাবটা বোঝা যায়

বর্তমানে জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান ১৯৫৫ সালে সংবাদে যোগ দিয়ে ১৯৬১ সালে পত্রিকাটির বার্তা সম্পাদক হন। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। সত্যবাক নামে দৈনিক বাংলায় শুরু করেন 'সত্যমিথ্যা, মিথ্যাসত্য' শিরোনামে বিশেষ কলাম। ১৯৮০-৮৭ সালে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য

কর্মকর্তা। পালন করেছেন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্বও। খুব কাছে থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছেন। ১৯৭৩-৭৫-এ তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব হিসেবে কাজ করেছেন।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আপনি তো ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন। নেতা শেখ মুজিবকে দেখেছেন। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখেছেন। আপনি কখন বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেছেন?

তোয়াব খান : বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অনেক আগে থেকেই দেখেছি। তবে প্রথম দেখা হয় স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীরা যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। বঙ্গবন্ধু জানতে চান– কে কী করেছে। তুমি কোথায় ছিলে। অনেকেই ছিলেন সেখানে। যারা শিল্পী গান গাইতেন। তারাও ছিলেন।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : সেটা কি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর?

তোয়াব খান : এটা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। গণভবনে। এখন যেটা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। রমনা পার্কের উল্টো দিকে। ওইখানে পুবদিকের বারান্দায় সবাই বসে ছিলেন। আমি তখন দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। আমি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দৈনিক বাংলাতেই গেলাম। আমাদের লক্ষ্যই ছিল যেখানেই ছিলাম, সেখানেই যাব। আমি নিজের বা আমার সহকর্মীরা, যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমার সঙ্গে, তাদের কাউকে এমন বলতে শুনিনি যে, আমি ফিরে গিয়ে আমি অমুক পদে যাব বা আমার একটা অতবড় পদ চাই। যে ছাত্র সে বলেছে, আমি ছাত্র, আমি ছাত্রই থাকতে চাই। খুব স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য ছিল, আমার যেখানে কাজ ছিল আমি সেখানেই যাব। সাংবাদিকতা করব। মানে দৈনিক বাংলায় কাজ করতে চাই। তখন বললেন, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : এটা তো গেল মুক্তিযুদ্ধের পরের কথা। মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগেই আপনি দৈনিক সংবাদ দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন। তারপর দৈনিক পাকিস্তানে ছিলেন। তখন কি কোনো সম্পর্ক ছিল?

তোয়াব খান : দৈনিক সংবাদে যখন বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করি, তখন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। একবার মোনায়েম খান, সবুর খান– এরা সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধও হয়েছিল। ওই সময় একটা লিফলেট ছাপা হয়। যেটা চারটি সংবাদপত্রে একই হেডলাইনে ছাপা হয়। পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও। ওই সময় রাজনৈতিক নেতাদের নামে এবং বঙ্গবন্ধুর নামে মামলা হয়। ওই সময় দেখা

হয়েছিল আমার। আমাকে সাক্ষী করেছিল। বললাম, আমি তো সাক্ষ্য দেব না। মোনায়েম খান বললেন, তাহলে আপনাকে সমন জারি করে নিয়ে আসা হবে। আমি বললাম ধরে নিলে আসব। আমি সত্যি কথা বলব। ওই সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তারপর একটা অকেশনে তার সঙ্গে দেখা হলো। সেটা হলো পহেলা মার্চের পর থেকে অসহযোগ আন্দোলনে পুরো দেশ যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, তখন দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক বাংলা হয়ে যায়। তখন সব খবর বিশেষভাবে ছাপা হয়েছিল। এটার একটা কারণ ছিল। তখন ঢাকার বাইরে পত্রিকা পাঠানো যেত না। কারণ, বাস বন্ধ, ট্রেন বন্ধ, বিমানও বন্ধ। পত্রিকা পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা এবং আশপাশে এই পত্রিকাকে আন্দোলনের অংশ হিসেবে নেওয়া।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আপনারা যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। আপনি ওখানে স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেখানে আপনি কথিকা লিখতেন। পিন্ডির প্রলাপ সম্পর্কে কি বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি কি কিছু জানতেন?

তোয়াব খান : আমার কথিকাটির নাম ছিল পিন্ডির প্রলাপ। হয়তো তাকে বলা হয়েছিল। এটা তো শোনার কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কেন, কোনো কিছুই শোনার কথা ছিল না।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : রাওয়ালপিন্ডির খবর কীভাবে পেতেন?

তোয়াব খান : এরপর আমি যেটা বলছিলাম, ওই অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমরা রাওয়ালপিন্ডি থেকে আমাদের যে সংবাদকর্মী, তাদের কাছ থেকে আমরা নোট পেতাম। নোটটা হচ্ছে– রাওয়ালপিন্ডিতে কী হচ্ছে। আমার বন্ধুরা জানিয়েছিলেন, আপনি যে খবরগুলো পাবেন, সেটা ওরে জানিয়ে দেবেন। ওরে দিতে মানে আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা আছেন, তাদের জানাতে হবে। আমি সেটা জানিয়ে দিতাম। টেলিফোন করতাম আমি। মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গের কেউ টেলিফোন করতেন। এটা ধরুন রাত ১০টার পর। আমাকে বঙ্গবন্ধু না চেনার কোনো কারণ নেই।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : এরপর আপনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব হলেন, সেটা কোন সালে?

তোয়াব খান : প্রধামন্ত্রীর ওখানে আমি যোগ দিয়েছি ১৯৭৩ সালের মে মাসে। এর আগে কিছু ঘটনা আছে। যেমন ১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ হয়। তখন মার্কিন দূতাবাস ছিল

প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে। ওখানে বিক্ষোভ করে ছাত্ররা। গুলি চলে। একজন ছাত্র নিহত হয়। এটা পত্রিকায় ছাপা হয়। পরের দিন হরতাল হয়। দৈনিক বাংলা তখন একটা টেলিগ্রাম বের করে। তখন বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। তিনি ছিলেন ঢাকার বাইরে। সরকার ওটা ভালো চোখে দেখেনি। টেলিগ্রাম বের করার একটাই উদ্দেশ্য, জনরোষের ভয়। যদি পত্রিকাটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়! দৈনিক পাকিস্তান একবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পত্রিকায় এতগুলো লোক কাজ করে। তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? রাতের বেলা ডাকা হলো আমাকে। তখন কেবিনেট মিটিং হচ্ছে। সেখানেই ডাকা হলো আমাকে। তারপর দৈনিক বাংলা থেকে চাকরি গেল আমার। হাসান হাফিজুর রহমান, তারও চাকরি গেল। আমাকে ওই সময় করা হলো ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির ওএসডি। আমার চাকরি চলে যেতে পারে। সেটাতে সরকারের হাত আছে। আমাকে ওএসডি করা হলে সেখানে আমি জয়েন করব কিনা সেটা আমার বিষয়। সেটাতে সরকার কিছু করতে পারবে বলে আমি মনে করি না। আমি পদত্যাগ করলাম। লিখিতভাবে দুই সপ্তাহ পর আমি পদত্যাগ করলাম। তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'দেখুন আমি তো আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারব না। কারণ, আমি আপনাকে পদত্যাগ করতে বলিনি। আপনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন।' আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো, এখন নির্বাচন প্রচারে ব্যস্ত আছি। যদি নির্বাচনে জিততে পারি তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী হবো। যদি মেজরিটি না পাই তাহলে আমি জাতির পিতা হিসেবে থাকব। তখন তুমি তোমার মতো কাজ করো। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলো তোমাকে করে দিতে হবে। আমি কী করব? তারপর নির্বাচন হয়ে গেল। ৭টা আসন বাদে বঙ্গবন্ধুর দল ২৯৩টা আসনে জিতল। আমাকে তখন নানা লোক নানান প্রস্তাব দিচ্ছে। এমনকি বিদেশে দূতাবাসে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছে। আমি ভাবলাম একটা শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় কাজ করে দূতাবাসে কাজ করার প্রস্তাব মেনে নিলে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে জাতির সম্মান লুটিয়ে দেওয়া হবে। যাওয়া উচিত না। আমি যাইনি। একদিন দুপুরে আমার মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে বাসায় ফিরেছি। আমার ওয়াইফ বললেন, গণভবন থেকে দুইবার টেলিফোন করেছিল। তোমাকে এক্ষুণি যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আমি যোগাযোগ করলাম। আমাকে যেতে বলা হলো। তখন দুপুর ২টা কিংবা আড়াইটা বাজে। গণভবনে গেলাম। থাকতাম খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ায়। ওখানে যখন গেলাম, দেখলাম তোফায়েল সাহেব আছেন। রাজ্জাক সাহেবও আছেন।

রফিকউল্লাহ চৌধুরী তখন সচিব। তিনিও ছিলেন। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু তখন সবেমাত্র লাঞ্চ করেছেন।

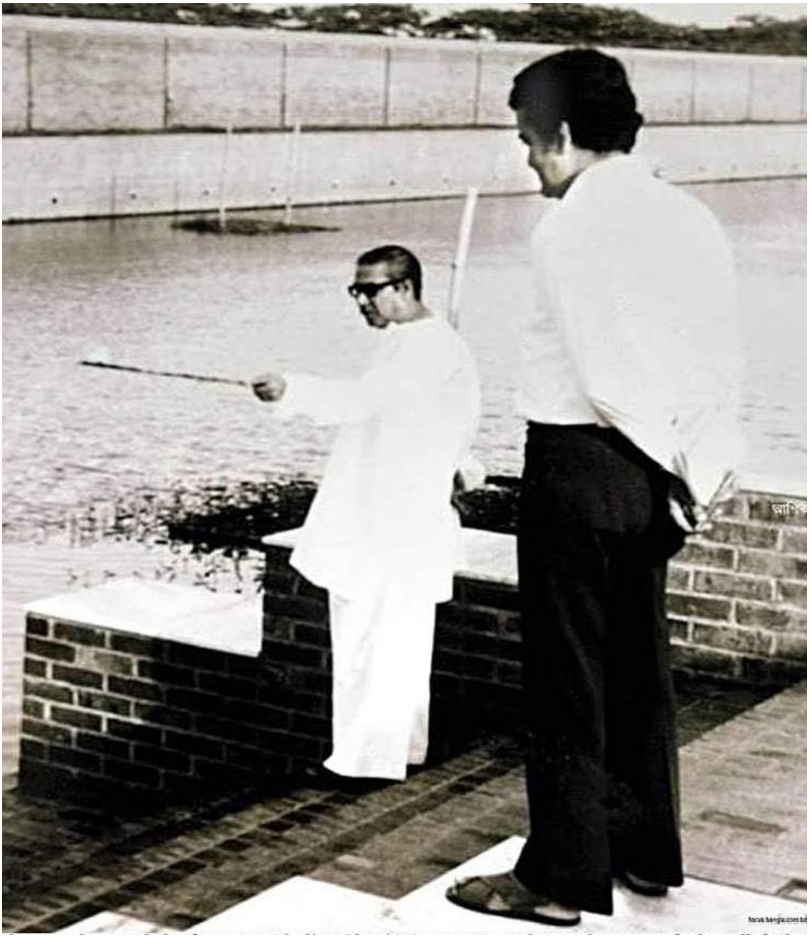

গণভবনের লেকের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রেস সচিব তোয়াব খান

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে একটু আপনার কাছে শুনি।

তোয়াব খান : সাদা ভাত। আমি যা যা দেখেছি, একেবারে সাদা ভাত খেতেন। এর সঙ্গে হয়তো ভাজি থাকত। মাছের ঝোল থাকত। মাগুর মাছের ঝোল। ডাল থাকত। খুব বেশি হলে হয়তো মুরগির এক-দুই টুকরো মাংস থাকত। পুডিং খাওয়ার একটা অভ্যাস ছিল তার। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও গেছি। যেতে হয়েছে। সকাল বেলা বঙ্গবন্ধু বলতেন তুমি আমার ওখানে এসো। তো গেছি।

বেগম মুজিব তো মাতৃরূপী ছিলেন। গেলেই বলতেন, 'আপনারা আসেন খান।' অনেক সময় মাফ চাইতে হতো। মধ্যবিত্ত খাবার। বাড়ির পরিবেশ একেবারেই ঘরোয়া। আমার-আপনার বাড়িতে যা খাই সেখানেও তাই খাওয়া হতো।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কি এসি ছিল?

তোয়াব খান : এয়ারকন্ডিশনার আমি দেখিনি। তো যা হোক, আগের কথায় ফেরা যাক। গণভবনে গেলাম। তিনি বললেন, কোথায় ছিলে তুমি? ইলেকশন হয়ে গেছে। এখন তো তোমাকে যোগ দিতে হবে। আমার কাজ করতে হবে। এই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে। কাজগুলো কী সেটা আমি পরে জেনেছি। বললেন, এখনই রফিকউল্লার কাছে গিয়ে যে কাগজপত্রগুলো সাইন করা দরকার, সাইন করো, তারপরে আসো। আমি খুব সাধারণভাবে কাজে যোগ দিলাম, মে মাসে। তারপর থেকে আমাকে বঙ্গবন্ধু বললেন, তিনি একটা আত্মজীবনী তৈরি করবেন। দুনিয়ার সব রাজনৈতিক নেতা এই আত্মজীবনী তৈরি করেন, তখন এটা তারা ডিকটেশন দিয়ে যান। এগুলো চেক করা। ট্রান্সক্রাইব করা। এডিট করা। এ হলো দুনিয়ার সর্বত্রই রীতি। আমাকে বঙ্গবন্ধু প্রথমত ডেকেছিলেন এ জন্য। আমি তো সেখানে যোগ দিলাম। এ সময় বঙ্গবন্ধু জুলিওকুরি শান্তিপদক পেয়েছেন। তিনি একটি বক্তৃতা দেবেন। আমাকে বললেন বক্তৃতা লিখে ফেলো। আমার কাজটা তো অন্য। অথচ তিনি বললেন, বক্তৃতাটা তুমিই লিখে দেবে। বক্তৃতা লিখে দিলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, তুমি যদি আগে আসতে, তাহলে আমার অনেক কাজ বেঁচে যেত। ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম। তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য যে ঘটনাগুলো ঘটল সেটাও ঘটত না।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা লিখেছি। একটু সংকোচের মধ্যে ছিলাম। সবেমাত্র যোগ দিয়েছি। আমিনুল হক বাদশাকে বললাম, তুমি এটা নিয়ে যাও। বাদশা নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফেরত এসে বলল, আপনি নিয়ে যান। আমি নিয়ে গেলাম। আমাকে বললেন, এর পর থেকে তুমিই নিয়ে আসবে। অন্য কাউকে দেবে না। ওই যে বললেন, তুমি এখন থেকে নিয়ে আসবে। কোনো অনুষ্ঠান হলে ডাক পড়ত।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আপনি যে বক্তৃতাটা লিখলেন। ওটা দেখে তিনি কী বললেন?

তোয়াব খান : বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। ওখানে তখন নিজে কিছু যোগ করলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, শুরু থেকেই বিশ্বশান্তির প্রতি আমাদের নিষ্ঠা এবং আস্থা। শান্তি ছাড়া আমাদের দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই বক্তৃতাটা শেষ হওয়ার পর আমার ঘাড়ে এসে পড়ল প্রেসের কাজ। হাসেম সাহেব

সত্যিকার অর্থে বিদেশে চলে যাওয়ার চিন্তা করেছেন। একদিন বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। তখন তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু আমার পদের কী হলো?' বঙ্গবন্ধু বললেন, রিপ্লেসমেন্ট দাও। আমাকে বললেন, তোমাকে এখানে যোগ দিতে হবে। তার দুই-তিন দিন পর হাসেম সাহেব চলে গেলেন। একদিন দুপুরে বসলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আত্মজীবনী নিয়ে। তখন দেখলাম, আত্মজীবনীর কাজের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না। একদিকে প্রেসের দায়িত্ব; এটা প্রায় সার্বক্ষণিক কাজ। আবার দুপুরবেলা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, এটা কোনোভাবেই জাস্টিফাই করা যাচ্ছে না। আমি তখন বললাম, বাইরে থেকে বিশ্বস্ত কোনো সাংবাদিক এনে কাজটা করা যেতে পারে। আমি গাফ্ফার সাহেবের নাম প্রস্তাব করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি নিয়ে আসো তাহলে। তো গাফ্ফার চৌধুরীকে নিয়ে এলাম সেদিন। তখন তার দ্বারা কাজ শুরু করলাম। বঙ্গবন্ধু যখন দুপুরের কাজ শেষ করে লাঞ্চ করে বিশ্রামে যান তখন কাজ করা হতো। রেস্ট তো হতো না। কোনো না কোনো লোক আসত। তখন এটা বন্ধ করে দিয়ে কাজটা করা হতো। তিনি বলে যেতেন। টেপ রেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করা হতো।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : এই টেপ কি আর পরে পাওয়া গেছে?

তোয়াব খান : এটাও একটা ঘটনা। ১৫ আগস্টের পরে আমাদের তো ঢুকতে দিত না সেখানে। আমরা নিষিদ্ধ ছিলাম। আবুল খায়ের সাহেবকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, টেপ রেকর্ডারের খবর কী। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনিও খুব উদগ্রীব ছিলেন টেপটা খুঁজে বের করার জন্য। তিনিও খুঁজে পাননি। আমার রুমেই ছিল। মাহবুব তালুকদারকে দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমার ডেপুটি ছিলেন। তিনিও সেটা পাননি। সম্ভবত ঘাতকরাই সেটা সরিয়েছে। ট্রান্সক্রাইব করা ছিল। টাইপ করা ছিল। কিছুই পাওয়া যাইনি।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কিছু স্মৃতি যদি আমাদের বলেন?

তোয়াব খান : ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনেক বিষয় আছে। আমরা তো সরকারি চাকরিতে বহিরাগত। বহিরাগত সাংবাদিক। আর ওখানে ছিলেন ব্যুরোক্রেসির লোকজন। স্বাভাবিকভাবে আমলাতন্ত্রের একটা অনীহা থাকে বাইরের লোকের ক্ষেত্রে। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। তবে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে ভিন্ন। রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছিলেন সেক্রেটারি। তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি একসময় ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। আমাদের বন্ধু আব্দুর রহীম। সবার সঙ্গে পরিচয় ছিল। রফিকউল্লাহ চৌধুরীর কন্যাই তো এখন আমাদের জাতীয় সংসদের স্পিকার। তো রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক করতে আমার কোনো বাধা হয়নি। আরেকজন ছিলেন যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলাম।

পরবর্তীকালে তিনি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। তারপর আমেরিকায় গিয়েছিলেন ডক্টরেক্ট করতে। তারপর জাতিসংঘে চাকরি করেছেন। পরে আর বাংলাদেশ সরকারে যোগ দেননি। বঙ্গবন্ধুর ওপরে তার লেখা আছে। শেখ হাসিনার ওপরে তার একটা লেখা আছে। এ লোকগুলোর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের প্রোটেকশন বা আশ্রয় না পেলে খুব কষ্টকর হয়ে যেত। একটা জিনিস হচ্ছে, তিনি অনুভব করতেন, আমরা যারা বাইরে থেকে আসছি, যে ইনফরমেশনগুলো পাই, জনগণের যে প্রতিফলন সেটা আমরা যেন সংগ্রহ করতে পারি। যে কারণে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্কটা ভালো হয়ে ওঠে। আমরা যখন জয়েন করি তখন আমাদের বেতন ছিল কম। বঙ্গবন্ধু বললেন, এত কম বেতনে চলে কীভাবে। তিনি বললেন, আমি ব্যবস্থা করছি। আমি এটা অ্যাভয়েড করেছি। এ জন্য করেছি, বঙ্গবন্ধু তো বিশাল হৃদয়ের লোক। এটা অহংকারের ব্যাপার না। এতে বঙ্গবন্ধুকে ছোট করা হবে। এভাবেই গড়ে উঠেছে সম্পর্কটা। যখন সচিবালয় পুরোনো গণভবন থেকে নতুন গণভবনে গেল, তখন গণভবনের পাশেই লালবাড়ি ছিল। সেখানেই আমার জন্য একটা বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, এ তো হলো। ও তো উঠে যাবে ওখানে। আমি বাইরে থেকে যে খবরগুলো পেতাম সেটা আর পাব না। শেখ মুজিবুর রহমান শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি যেহেতু জাতির পিতা এবং ওইভাবে সরাসরি ব্যবহারটা করতেন। কিছুক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে দেরি হয়েছে। তিনি খোঁজ করেছেন, পাননি। আমাকে বললেন, কী খবর, বলো। ব্যক্তিগত কী দরকার। কারও যদি চিকিৎসার দরকার হয় ইমিডিয়েটলি ডাক্তারকে ফোন করো। মানে ব্যক্তি পর্যায়ে তিনি খোঁজখবর নিতেন।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি বিশেষ কোনো স্মৃতির কথা শুনতে চাচ্ছি। যেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং।

তোয়াব খান : কাজ নিয়েই সম্পর্ক। আমার ব্যক্তিগতভাবে পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা। খুব স্বাভাবিকভাবে আমার খুব সংকোচ ছিল, দ্বিধা ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজে ডেকে এগুলো দূর করে দিয়েছেন। যে মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন হবে, সরাসরি তাকে বলা। কোনো সংকোচ করার দরকার নেই। ১৯৭৪ সালে এক দিন, ওই সময় লবণের দাম বাড়ছে। তখন খিলগাঁও থাকি। বাসা থেকে জানানো হলো, কিছুক্ষণ আগে লবণ কেজিতে কিনেছি ১০ টাকা। এখন এসে বলছে ১৫ টাকা। তার ১০ মিনিট পর বলছে ২০ টাকা। আমি তখন বঙ্গবন্ধুকে গিয়ে জানালাম, 'এই হচ্ছে অবস্থা।'

বঙ্গবন্ধু তখন নির্দেশ দিলেন, কে করছে, কোথায় করছে, কী অবস্থা খোঁজ নিতে। পুলিশকে পাঠালেন। ওই জায়গায় যাও। এই করো। দেখো। ব্যবস্থা নাও।

এভাবে ব্যক্তিগতভাবে যখনই বলেছি, তখনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু? তিনি অনেক ঠাট্টা করে, পরিহাস করে কথা বলতেন। একদিন তিনি বললেন, আমার বাড়ির গরুর শিংটা প্যাঁচানো। এমন প্যাঁচানো শিং কার আছে জানো? মহাদেবের গরুটা আছে না। তার শিংও এমন। আমি বললাম, 'মহাদেব তো মহাদেব। নীলকণ্ঠ।' গণভবনে লেকের পানিতে মাছ ছাড়া আছে। বঙ্গবন্ধুর একটা অভ্যাস ছিল, কাজ শেষ করে বিকেলে কিছুক্ষণ পায়চারি করতেন। ওই সময় তার সঙ্গে থাকতে হতো। আমরাও আগ্রহ নিয়ে থাকতাম। যদি কিছু পাওয়া যায়। আমাদের জীবনী তৈরি করতে হচ্ছে। ওখানেও কাজে লাগতে পারে। বঙ্গবন্ধু ওখানে গিয়ে মাছগুলোকে খাবার দিতেন। বঙ্গবন্ধু গেলে মাছগুলো সব ওখানে হাজির হতো। আমরা অবাক হতাম, ছবি তুলতাম। তিনি লাঠিতে করে দেখাতেন, এই দেখো।

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। গণভবনের আশপাশে যারা থাকে, তারা হঠাৎ গেছে গণভবনে, ১৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুকে ফুল দিতে। আমি জানিও না। আমি কাজ করছি। বঙ্গবন্ধু কাউকে বললেন আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে। আমি গেলাম। একটা ছোট মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখো ও বলছে আমাকে চেনে।' দেখি আমার মেয়ে এষা। বললাম, ও চিনলে আমি কী করব। বঙ্গবন্ধু বললেন, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান দেওয়াতে পছন্দ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি কে? ও বলছে, আপনি আমার বাবাকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, কে তোমার বাবা। বলতে চায়নি। দুই তিনবার বলার পর বলেছে।

তুমি এখানে আসোনি কেন। আমি বললাম, ওরা এসেছে ওদের মতো করে। আমি এসেছি আমার মতো। যে কেউ যখন গেছে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আর প্রধানমন্ত্রী থাকেননি। তখন ব্যক্তি মুজিব সবার ওপরে।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাকশাল হওয়ার পরও আপনি তো কাছ থেকে দেখেছেন বঙ্গবন্ধুকে।

তোয়াব খান : বাকশাল হওয়ার পরও সবাই একই পদে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন প্রধানমন্ত্রী তখন আমার পদটি ছিল জয়েন্ট সেক্রেটারি পদ। বঙ্গবন্ধু যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন এই পদটার নাম হলো প্রেস সেক্রেটারি। আমার থেকেই শুরু এ পদ। বঙ্গবন্ধুই এ পদ তৈরি করে গেছেন। গার্ড রেজিমেন্টের পোশাক কী হবে সেটা বঙ্গবন্ধু নিজেই ঠিক করেছেন। রাষ্ট্রপতির পতাকা হবে মেরুন কালারের, বঙ্গবন্ধু ঠিক করে গেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছ থেকে একুশে পদক গ্রহণ করছেন তোয়াব খান

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কের বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

তোয়াব খান : ইন্দিরা গান্ধী মনে করতেন বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নয়, এ অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে। কিছু কিছু লেখা আছে। কবীর চৌধুরীর লেখা আছে। আবার সালাহউদ্দিন সাহেবের লেখা আছে। আমরা নিজেরা বাইরে থেকে সম্পাদক হিসেবে দেখেছি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধু একটা কথা বললে ইন্দিরা গান্ধী সেটা মেনে নিতেন। এ নিয়ে এম আর আখতার মুকুলের লেখা আছে।

বঙ্গবন্ধু কলকাতায় গেলেন প্রথম ভিজিটে। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। ডিজি ইনফরমেশন ওখানে গেছেন। তিনি বললেন, কী হবে। কোনো এজেন্ডা নেই আলোচনার। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, দেখো বাংলাদেশে যদি বিদেশি সৈন্য থাকে তাহলে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশ স্বাধীন কিনা এটা নিয়ে সংকোচ প্রকাশ করবে। তাই আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া। তখন মুকুল সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, তাহলে কী আলোচনা হবে? বঙ্গবন্ধু বলেন, দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে আমার স্বাধীন দেশে যদি বিদেশি কোনো সৈন্য থাকে, তাহলে অন্য কোনো দেশ এটাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করবে। আমি মিসেস গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে এটাই তুলব, ভারতীয় সৈন্য কবে প্রত্যাহার করা হবে। ঘটনাক্রমে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বসলেন, বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এদেশ তো আপনাদের জন্য স্বাধীন

হয়েছে। আপনারা অনেক উপকার করেছেন। এখন আপনাদের সৈন্য প্রত্যাহার করুন।' ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে বলেছিলেন, 'দেখুন, আমাদের তো কোনো সৈন্য রাখার ইচ্ছা নেই। তবে আমি যতদূর শুনেছি, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন সরকারের অনুকূলে নয়। আরও কিছুদিন রাখলে কেমন হয়? 'বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে। যদি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যদি আরও কয়েক লক্ষ লোককে জীবন দিতে হয়, সেটাতেও রাজি আছি আমরা।'

তখন ইন্দিরা গান্ধী বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা তাহলে ১৭ মার্চ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেব।' এটা বললেন ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। বঙ্গবন্ধু বললেন, '১৭ মার্চ কেন?' ইন্দিরা গান্ধী বললেন, 'কারণ ১৭ মার্চ আপনার জন্মদিন।'

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আপনি কোথায় ছিলেন? বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছিল?

তোয়াব খান : ১৫ আগস্ট আমি ছিলাম গণভবনের পাশে আমার বাড়িতে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৪ আগস্ট রাতের বেলা। ১৪ আগস্ট রাতের বেলা গণ্ডগোল হলো। আমি বসে আছি। হঠাৎ টেলিফোন এলো। একটা ভারতীয় হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেটা ফেনীতে ক্রাশ করে। তখন রটে যায় উইদাউট পারমিশনে সেটা যাচ্ছিল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সেটিকে গুলি করে নামিয়েছে। এটা মিথ্যা কথা। হেলিকপ্টারটা দুর্ঘটনায় পড়েছে। তখন তো দেশে ইমার্জেন্সি চলছে। রেডিও-টেলিভিশন থেকে সবাই জানতে চাচ্ছে ঘটনাটা কী। আমি তখন চিন্তা করছি কাকে ধরা যায়। যেহেতু হেলিকপ্টার বিমানবাহিনীর। আমি প্রথমে আমার বন্ধু খাদেমুল বাশার, উপপ্রধান বিমানবাহিনী, তাকে ফোন করলাম, জিজ্ঞেস করলাম তুই কিছু জানিস কিনা। সে বলল, এই ঘটনা। তারপর খন্দকার সাহেবকে ফোন করলাম। তখন তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান। তিনিও বললেন, 'ঘটনা এই। যেটা রটেছে সেটা ঘটনা না। 'তখন আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম। এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি।' এরই মধ্যে খবরের কাগজ থেকে এগুলো জানতে চাচ্ছে। টিভি জানতে চাচ্ছে এ নিউজটা আমরা দেব কিনা। বঙ্গবন্ধু বললেন, নিউজ চাপা দিলে গুজব বাড়ে। গুজবকে মারতে হলে সত্যি ঘটনাটা জানানো উচিত। তুমি সত্যি ঘটনাটা দাও। বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে এগুলো ঘটতে থাকে। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার যিনি ছিলেন, তিনি বললেন, খবরটা রেডিও-টেলিভিশনে দিচ্ছেন কিনা?' বললাম, আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটা রেডিও-

টেলিভিশনে যাবে। তিনি বললেন, কোন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত? তখন আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আমি প্রেস সেক্রেটারি। আমি বললাম সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। তখন তিনি মেনে নিলেন। ভারতেও তখন ইমার্জেন্সি চলছে। ওখানে সেন্সরশিপ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর আমাকে ফোন করলেন, খবরটা কী হচ্ছে। দিচ্ছেন নাকি। আমি বললাম, আপনার মন্ত্রণালয়ে এটা প্রচার করা হয়েছে। আপনি শোনেননি।

এই হচ্ছে সন্ধ্যার ঘটনা। তারপর সন্ধ্যায় আবার আমাদের ওখানে তিনজন– মনোয়ার হোসেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি; ফরাসউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন; মসিউর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা– এই তিনজন বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য যাবেন। তাদের জন্য দশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি সেদিন রাতের বেলা। আমার মনে আছে, আমি বসে কাজ করছিলাম। বঙ্গবন্ধু পরের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। বিশেষ কনভেনশনে বক্তৃতা দেবেন। ওই বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এক্সটেম্পোর দেবেন। কারণ, বঙ্গবন্ধুর কতকগুলো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। যেমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একসময় বঙ্গবন্ধুকে বহিস্কার করেছিল। সেই বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুকে একটা ডক্টরেক্ট ডিগ্রি দেবে। সেখানে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করবেন। আমাকে বললেন, তোমার যে ডাটা ইনফরমেশন যোগ করার দরকার হয়, এটা মোটা কার্ড পেপারে লিখে আমাকে দেবে। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মোজাফফর হোসেন চৌধুরী, মোকাম্মেল সাহেব তখন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব। তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে একটা কার্ডে বাসায় বসে লিখছি। রাত তখন প্রায় ১২টা হবে। হঠাৎ লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধু ফোন করলেন, কাল সকালে তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাসায় চলে আসবা। আর কার্ড নিয়ে আসবা। মোটা মোটা অক্ষরে। আমি এক্সটেম্পোর বক্তৃতা করব। প্রয়োজনে এই কথাগুলো বলব।

তখন রাত ১২টা। বললাম, আমি ওই কাজই করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি আসো। এর মধ্যে ভোর হয়েছে। সবাই যেমন শুনেছে। আমিও গোলার আওয়াজ শুনেছি। মর্টারের আওয়াজ শুনেছি। তারপরে রেডিও অন করা হয়েছে। সব জায়গায় কান্নার রোল পড়েছে। সব জায়গায় পড়েছে। খোঁজখবর নিচ্ছি, কোথায় কী অবস্থা। আমাদের সেক্রেটারি কিছু জানেন কিনা। এনএসআই প্রধান জানেন কিনা। তাদের কাছ থেকে যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে, আমরাও তো শুনেছি।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : কর্নেল জামিল মারা গেছেন। ফরাসউদ্দিন আক্রান্ত হয়েছেন। আপনিও তো আক্রান্ত হয়েছিলেন। আরেকবার আক্রান্তের মুখে ছিলেন। এটা বাদ দিয়ে গেলেন কেন?

তোয়াব খান : ওটা বলিনি। ১৫ আগস্ট সকালে আমার ছোট ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কোনো কিছু হচ্ছে কিনা। কিছু হলে আমি সেটাতে যোগ দেব। দেখি, আর্মির ট্রাক যাচ্ছে। আমি সেটা অ্যাভয়েড করে মোহাম্মদপুরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে বিহারিরা। তখন আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই। ৩২ নাম্বার তো বেশ দূরে। যখন যাচ্ছিলাম আমাকে তো কেউ চিনতেও পারেনি। তারপর তারা চলে যায়। তারপর গণভবনে ১৯ কিংবা ২০ আগস্টের ঘটনা। তাহের উদ্দিন ঠাকুর বলেছিলেন, গণভবনে আসেন। তখন তো আমার বাড়িতে লাল টেলিফোন কাটা। অন্য টেলিফোনগুলো কোনোটা ধরতে পারি, পারি না। অনেকে আছে যারা আশপাশে ঘুরেছে, তারা অনেকে মন্ত্রী হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এমন অনেকেই ছিলেন, প্রেস ক্লাবে গেলে কেমন করে কথা বলতেন। প্রেস ক্লাবে গেছি ১৯ তারিখের পরে। একদিন যেতে বললেন। বঙ্গভবন তো চেনা আমাদের। ওখানে পুলিশ যারা ছিল, তারা বলল সামনে দিয়ে না গিয়ে পেছন দিক দিয়ে যান। আমি ঢুকে যাচ্ছি। রাষ্ট্রপতির আসনে খন্দকার মোশতাক বসে আছেন। মিটিং শেষ হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর বের হয়ে এসে বললেন, 'উনি এখানে কেন।' কিছুক্ষণ পর দেখলাম যিনি সচিব ছিলেন, তিনি সচিবের রুমে বসে কাজ করছেন।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হতো বা দেখেছেন তাদের। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন যখন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে আপনি একুশে পদক পেয়েছেন।

তোয়াব খান : বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তবে শেখ রেহানা, শেখ কামাল, জামাল। শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার সেই সময় খুব একটা সাক্ষাৎ হয়নি। একটা সময় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ৩২ নাম্বারে। তারপরে তো চলে গেল। বঙ্গবন্ধু যখন জ্যামাইকাতে কমনওয়েলথে যান তখন শেখ হাসিনা এবং ওয়াজেদ সাহেব দুজনই জার্মানিতে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিমান দিল্লি থেকে সরাসরি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেখানে ড. ওয়াজেদ দেখা করতে আসেন। আমি ওই ফ্লাইটে ছিলাম।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকতা ব্যাহত হতো?

তোয়াব খান : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকা কাজের সূত্রে। আমার ব্যক্তিগত পেশা তো সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার সত্যিকারের যে দর্শন, সেটাই আমি মেইনটেইন করার চেষ্টা করেছি। আমার যেটা মনে হতো এবং এখনও মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকদের সম্পর্কটা ছিল ব্যক্তি পর্যায়ের। এ রকম সম্পর্ক যদি আমাদের সব রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে গড়ে উঠত, তাহলে আজ মিডিয়ার কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কোনো কিছু উপহার দিয়েছেন?

তোয়াব খান : ওই সময়ে আমি অটোগ্রাফ নিয়েছি অনেক। তার অটোগ্রাফ নিয়ে বিদেশে ছবি পাঠিয়েছি। দেখেছি বিদেশি অনেকেই বঙ্গবন্ধুর অটোগ্রাফ নিয়েছে।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর কোন জিনিসটি আপনি মনে করেন যে, এখনকার সময়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং একান্ত দরকার।

তোয়াব খান : আমি কতকগুলো জিনিস মনে করি। এক নাম্বার বঙ্গবন্ধুর যে নীতি-আদর্শ ছিল সেগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। কিছু হচ্ছে। আরও দরকার। এক্ষেত্রে নিজে বোঝার চেষ্টা করেছি। সারা দুনিয়াতে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝায়। সেটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে না। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন ধর্মের ক্ষেত্রে সব ধর্মের সমান অধিকার। এটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। আরেকটা মনে করতেন। সমাজতন্ত্র। এটা কী? আজকে ধরুন মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র আছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে সমাজতন্ত্র কী ছিল? এদেশের মানুষ গরিব। তাদের মুখে হাসি ফোটানোটাই সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু বলতেন, এদের সমাজতন্ত্র খুব কঠিন না। এখানে সমাজতন্ত্র হবে যারা গরিব তাদের একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা। শোষিত মানুষের সমাজতন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু যখন আলজেরিয়ায় যান। সারা দুনিয়ায় তখন একদিকে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড সমাজতান্ত্রিক দেশ। এই দুই ভাগে ভাগ। তখন দুই ভাগের বাইরে যারা, যেমন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, তারা আলাদা। একদল একটা শ্লোগান তুললেন থার্ড ওয়ার্ল্ড। একসময় সেটা খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বঙ্গবন্ধু যখন গেলেন তখন প্রশ্ন জাগল, আমরা কি থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোক, নাকি জোটনিরপেক্ষ। বঙ্গবন্ধু তখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কী, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কী– এসব মৌলিক প্রশ্নে না গিয়ে বললেন, 'দুনিয়ার সবাই শোষিত। আমরা সব সময় শোষিতের দলে।' আমরা এখনও শোষিতের পক্ষে কাজ করছি।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধু তো উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সময় আমরা অনেক বড় মাপের রাজনীতিবিদ দেখেছি, যারা বিরোধী দলে ছিলেন। তাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আচরণ কেমন ছিল। অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে তার আচরণ কেমন ছিল?

তোয়াব খান : ছাত্রাবস্থা থেকে ব্রিটিশবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন করে আসছেন এবং বাংলাদেশের যে রাজনীতি, যার মূল উপাদান মূলত একটা শব্দ, গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রটা পার্লামেন্টের ভিত্তিতে। যারা এই গণতন্ত্রের সংশোধনীতে ছিলেন, যারা এই রাজনীতিতে ছিলেন, দেশ ভাগের অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই তাদের বিষয়ে জানতেন। ভালো পরিচয় ছিল। তাদের মধ্যে একজন রাজাকার বলে পরিচিত শাহ আজিজ। জাতিসংঘে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করতে। শাহ আজিজ রাজাকার হিসেবে জেলে ছিলেন। মওলানা ভাসানীকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। বাকশাল যখন হলো আমার জানা মতে, তখন বঙ্গবন্ধু তিন রাত ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেছেন। নিশ্চয় আলোচনা হয়েছে।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে শেষ কথা কী বলবেন?

তোয়াব খান : তিনি তো শুধু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি সবার জন্য। আরও ওপরে, তিনি জাতির পিতা। এ হিসেবে সবাই একটা ছত্রছায়া পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে গর্বের বিষয়, আমি তার ছায়ায় থেকেছি। মুশকিল হচ্ছে মহানায়ক বা মহামানবদের সঙ্গে কাজে থাকা অবস্থায় তাদের বিষয়টা বোঝা যায় না। যখন তার অভাব হয়, তখন বোঝা যায় তার গুরুত্ব। যারা মহামানব তারা নিজের কর্মে এতই ব্যস্ত থাকেন, তারা নিজেরাও বোঝেন না। তাদের সবসময় কাজ করতে হয়। যখনই ছায়াটা সরে যায় তখনই অভাবটা বোঝা যায়।♦

সৌজন্যে : ১৯ অক্টোবর ২০২০, দৈনিক সমকাল

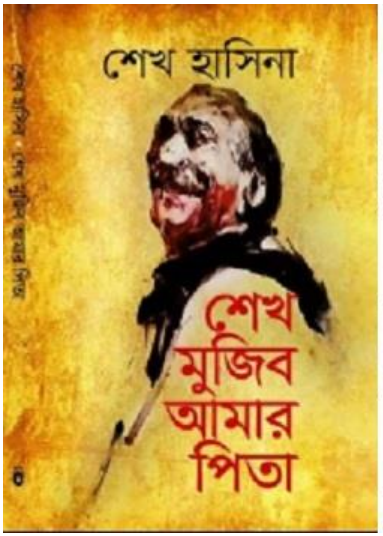

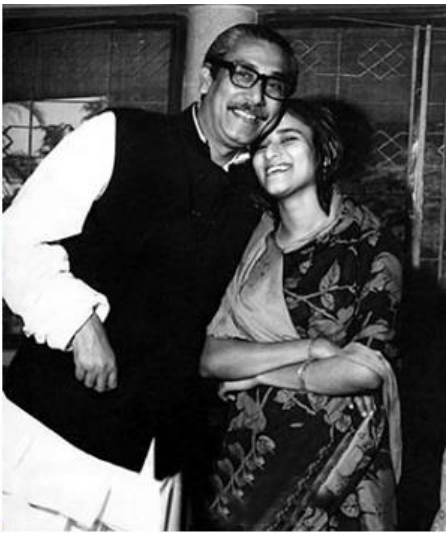

পিতাকে নিয়ে কন্যা শেখ হাসিনার বই ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’

মাহবুব রেজা

স্কুলটা বাড়ি থেকে বেশ দূরে। সোয়া কিলোমিটার। ছোট খোকা সেই স্কুল মানে গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুলের ছাত্র। তখন চলছে ভর বর্ষাকাল। চারদিকে ফুঁসে উঠছে পানি। নৌকা করে স্কুলে যেতে হয়। একদিন নৌকা দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঘটল এক দুর্ঘটনা। বর্ষার পানিতে নৌকা ডুবে গেল। নৌকার মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিল। খোকা ভরা বর্ষার পানিতে হাবুডুবু খেয়ে কোনমতে পাড়ে এসে উঠল। এদিকে এ খবর দাদির কানে যাওয়া মাত্র তিনি মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে

পড়ে গেলেন। সেদিন থেকে দাদির কড়া ঘোষণা খোকার স্কুলে যাওয়া বন্ধ। গোটা বংশের আদরের দুলাল– এক রত্তি সোনার টুকরো নাতি বলে কথা! নাতিকে কলিজার টুকরা বলে জ্ঞান করতেন।

টুঙ্গিপাড়া থেকে স্কুল বদল করে খোকাকে পাঠানো হলো ওর বাবার কাছে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো তাকে। এরপর খোকার পুরো কৈশোর কেটেছে সেখানেই। শৈশবের গ্রাম, চপলতা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো– সব মিলিয়ে খোকার ছোটবেলাটা ছিল আর আট-দশটি আটপৌরে বাঙালির মতোই।

সেদিনের সেই ছোট্ট খোকা পরবর্তীতে নিজের প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতা দিয়ে পরিণত হয়েছিলেন মানুষের নেতায়। বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টায়, বঙ্গবন্ধুতে, স্বাধীনতার স্থপতিতে। বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় এক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। যাঁর উচ্চতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আকাশতক। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির আত্মমর্যাদার নাম। অহংকারের নাম।

বঙ্গবন্ধুর সিংহ হৃদয় মানুষের জন্য সবসময় প্রসারিত ছিল। মানুষকে পরম মমতায় নিজের করে নিতে পারার এক ঐশ্বরিক গুণ ছিল তাঁর। আর মানুষও তাঁর কথায় জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে এনে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, হে মহান নেতা, তোমার জন্য আমরা সব অসাধ্য সাধন করতে পারি।

যুদ্ধদিনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে তাঁর অমোঘ বাণীকে সত্যে পরিণত করেছিল। কী সেই বাণী? 'আমাদের কেউ দাবায়া রাখতে পারবে না'। সত্যিই বাঙালিকে কেউ 'দাবায়া' রাখতে পারেনি। তখনও না। এখনও না। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে বাঙালি এগিয়ে চলেছে।

দুই.

তাঁর অনেক পরিচয়। একের ভেতর অজস্র। পুত্র, ভাই, স্বামী, চাচা, মামা, দাদা, নানা, শ্বশুর, শুভাকাঙ্খী, নিকটজন, নেতা– কত পরিচয়েই না তিনি পরিচিত। সব পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন সজ্জন মানুষের প্রতিকৃতি, একজন বিনয়ী মানুষের অবয়ব সর্বোপরি সিংহ হৃদয় ও বাঙালি অন্তপ্রাণ। প্রতিটি পরিচয়ে নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। তাঁর এতসব পরিচয়ের বাইরে একটি পরিচয় নিয়ে কৌতূহল চেপে রাখা বেশ কষ্টকর। সেটা হলো পিতা হিসেবে কেমন ছিলেন বঙ্গবন্ধু?

সারাটা জীবন মানুষের জন্য ব্যয় করেছেন এই সিংহ হৃদয়ের বাঙালি। মানুষের সুখে-দুঃখে, কষ্টে, বেদনায় তিনি তাদের পাশে থেকেছেন। অন্যায়-জুলুমের

প্রতিবাদ করেছেন। শোষিতের পক্ষে অবিচল থেকেছেন। দেশ, ভাষা আর মানুষ– এই তিন ছিল তাঁর রাজনীতির মূল মন্ত্র। তাঁর রক্তে, অস্থিমজ্জায় রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। সকাল থেকে মধ্যরাত অবধি মানুষকে নিয়ে থেকেছেন– জীবনে এর কোন প্রত্যয় হয়নি কিংবা কথাটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে এ অঞ্চলের খেটেখাওয়া, অধিকারবঞ্চিত মানুষের পক্ষে লড়াই করাকে ধ্যান-জ্ঞান বলে গণ্য করতেন। বাঙালির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর পরোয়ানা কাঁধে নিয়ে নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময়ও বলব আমি বাঙালি, আমি মুসলমান। বাঙালি একবার মরে, বারবার মরে না।' আকৃতিগত দিক থেকে বাঙালি গড়পড়তায় খর্বকায় হলেও দীর্ঘ আকৃতি পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই উচ্চতা প্রভাব ফেলেছিল তার স্বভাব ও চরিত্রেও। রাজনীতিতে সবাইকে পেছনে ফেলে তিনি অনন্য এক উচ্চতা তৈরি করেছিলেন। রাজনীতি গবেষকরা তাদের গবেষণায় বলছেন, বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ এই তিনের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে।

পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কেমন ছিলেন? এ বিষয়টি জানা যায় তাঁর বড় মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা থেকে। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে শেখ হাসিনা অপার মমতায় পিতার প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন। তিনি পিতার প্রতিকৃতি তৈরি করতে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ বাঙালির চিত্রই তৈরি করেছেন। পিতা বঙ্গবন্ধু ছোটবেলায় কেমন ছিলেন তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা লিখছেন, "দাদা আমাদের কাছে গল্প করলেন যে, 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত। আব্বা যদি ধারেকাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন।"

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। 'আমার জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়তেন, রাজনীতি করতেন। খবর পেয়েও দেখতে আসেন বেশ পরে।' বড় মেয়ে হিসেবে বাবাকে বেশ কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। রাজনীতিতে তখন বঙ্গবন্ধুর ব্যস্ততা বাড়তে শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্বে, চিন্তা-ভাবনায় হৃদয়বান মানুষের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠত। 'দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আমগাছের নিচে

এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তাঁর খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার' এক গরিব ছেলেকে তাঁর শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন।'

ছোটবেলা থেকেই দান-দক্ষিণায় উদারহস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু– শেখ হাসিনার লেখা থেকে এর প্রমাণ মেলে। পড়াশোনার পাশাপাশি সাধারণ ছাত্রদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জোরালো ভূমিকাও রাখতেন তিনি। গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি এবং সেখান থেকে ১৯৪৬ সালে বিএ পাস করেন। এই সময় দেশভাগ হলে দাঙ্গা শুরু হয়– দাঙ্গা দমনে বঙ্গবন্ধু সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজের গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সোচ্চার। এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা তাঁর পিতাকে নিয়ে একটি অসাধারণ মানবিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন, 'এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি। একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাই-বোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসুপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।'

কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই।

পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বন্ধু বৎসল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যখন সময় কাটাতেন তখন তিনি যেন সত্যি সত্যি 'ছোটদের' মতোই হয়ে যেতেন।

ছোটদের মতো মন খুলে সব কথা বলতেন বড় মেয়ের কাছে। রাজনীতিতে পুরোপুরি আচ্ছন্ন থেকেছেন। শেখ হাসিনা লিখেছেন, "বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগ পেতাম। তাঁর একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব।' কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে।"

পিতার মতো কৈশোরে চঞ্চলতা, দুষ্টুমি শেখ হাসিনাকেও মাতিয়ে রাখত। পিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজের ফেলে আসা ছোটবেলার কথা নির্বিঘ্নে জানান দিচ্ছেন, "বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাটা ও কাঁচামরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আমমাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতা এই আমমাখা পুরে যে না খেয়েছে। সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না আর কলাপাতায় এ আমমাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্যরকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারামারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড় তালাপের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারও পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না তখন সেই বরইটার জন্য মনজুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই।"

'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত তৈরি করবে। একজন আটপৌরে বাঙালি কী করে একজন দায়িত্ববান পিতা হয়ে উঠতে পারে–এ বই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।♦

লেখক : কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম মুসলিম নারী গুপ্তচর অপ্রতিরোধি যোদ্ধা

নুর ইনায়েত খান

কাজী আখতারউদ্দিন

নুরুন্নেসা ইনায়েত খান ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্র বাহিনীর প্রথম মুসলিম নারী সিক্রেট এজেন্ট। অসীম সাহসিকতার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর জর্জ ক্রস পদকে ভূষিত করেন। যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোতে এটাই ছিল সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক/খেতাব। একজন স্পেশাল অপারেশন এজেন্ট হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম নারী রেডিও অপারেটর। ফরাসি প্রতিরক্ষা যোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য তাঁকে ব্রিটেন থেকে অধিকৃত ফ্রান্সে পাঠানো হয়।

১৯১৪ সালে ১ জানুয়ারি রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় নুর ইনায়েত খানের জন্ম। তাঁর পিতা সুফি সাধক হযরত ইনায়েত খান ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মুসলমান। সুফি ইনায়েত খানের মাতা ছিলেন মহিশুরের টিপু সুলতানের বংশধর। চিশতিয়া সুফি ঘরানার অনুসারি ইনায়েত খান একজন সুফি শিক্ষক এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে ইউরোপে বসবাস করতেন। নুরুন্নেসার মা, পিরানি আমেনা বেগম (ওরা মিনা রে বেকার) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউমেক্সিস্কোর অধিবাসী। ইনায়েত খান যখন আমেরিকায় সুফিবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তাঁর সাথে আমেনা বেগম ওরফে ওরা মিনা বেকারের সাথে সাক্ষাত ও পরিণয় হয়। ঐ সুফি দম্পতি তাঁদের আদরের মেয়ের নাম রাখলেন নুর-উন-নেসা অর্থাৎ 'নারীত্বের আলো'। তাকে পিরজাদি পদবি দেওয়া হল। তবে বাড়িতে ওরা ঐ আদরের মেয়েটিকে বাবুলি বলে ডাকতেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পর ইনায়েত খান সপরিবারে রাশিয়া ছেড়ে লন্ডন চলে আসেন। সেখানে ওরা ছয় বছর থাকেন। লন্ডনে ইনায়েতে খানের আরো তিন সন্তানের জন্ম হয়।

নুরের বয়স যখন ছয় বছর, তখন ঐ পরিবার ১৯২০ সালে আবার ফ্রান্সে চলে যান এবং প্যারিসের উপকণ্ঠেই সুরেসনেসে একটি বিশাল বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। হযরত ইনায়েত খান বাড়িটির নাম দেন 'ফজল মঞ্জিল'- অর্থাৎ 'আশীর্বাদের বাড়ি'। এটা ছিল ঐ পরিবারের জন্য একটি আদর্শবাড়ি, খোলামেলা ঐ বাড়িটিতে ক্লাসিকেল সঙ্গীতচর্চা হতো এবং সারা বছরই সুফিসাধকদের আনাগোনা ছিল। চারভাইবোন ভারতীয় প্রথায় পোশাক পরে বাড়ির আঙ্গিনায় খেলতো আর বাড়ির বাইরের উঁচু সিঁড়িতে বসতে পছন্দ করতো।

১৯২৭ সালে হযরত ইনায়েত খান ভারতে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন, কেননা তখন তার শরীর তেমন ভালো চলছিল না। দুর্ভাগ্যবশত কয়েকমাস পরই সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। দিল্লিতে ইনায়েত খানকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে পুরো পরিবারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। নুরুন্নেসার মা আমেনা বেগম মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় পিতার মৃত্যুর পর তের বছরের কিশোরী নুরুন্নেসা তাঁর শোকাহত মা এবং ছোট ভাইবোনদের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তরুণ মেয়েটি বেশ চুপচাপ, লাজুক এবং একজন স্বপ্নচারী ছিলেন। তিনি সরবোন কলেজে চাইল্ড সাইকোলজি এবং প্যারিস কনসারভেটরিতে বীণা ও পিয়ানো বাজানো শিখতে থাকেন। অন্যদিকে কবিতা এবং ছোটদের জন্যও গল্প লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে ছোটদের ম্যাগাজিন এবং ফ্রান্সের রেডিওতে নিয়মিত কাজ

করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে *বিশটি জাতকের গল্প* নামে তাঁর রচিত একটি বই লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জার্মান বাহিনী যখন ফ্রান্স দখল করলো, তখন আরো অনেকের মতো নুরুন্নেসার পরিবারও সাগরপথে লন্ডনে পালিয়ে গেলেন। ১৯৪০ সালের ২২ জুন ওরা কর্নওয়ালের ফ্যালমাউথে পৌঁছলেন।

বিমান বাহিনীর নারী সহায়ক দলে যোগদান

পিতার শান্তিবাদি শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত হলেও, নুরুন্নেসা ও তাঁর ভাই বেলায়েত খান নিপীড়ক নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্র বাহিনীর লড়াইয়ে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেলায়েত খান ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে যোগ দিলেন আর নুরুন্নেসা খান ১৯৪০ সালের ১৯ নভেম্বর ওমেন'স অগজিলারি এয়ারফোর্সে (Women's Auxiliary Air Force WAAF) যোগদান করলেন। একজন ওয়ারলেস অপারেটার হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ স্কুলে পাঠানো হল। তখন তাঁর পদবি ছিল এয়ারক্রাফ্টওম্যান সেকেন্ডক্লাস। জুন ১৯৪১ তিনি একটি বম্বার ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হলেন। তারপর একঘেয়ে রুটিন কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কমিশনের জন্য আবেদন করলেন। অবশেষে তাঁকে এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হল।

স্পেশাল অপারেশন এগজিকিউটিভ এফ সেকশন এজেন্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ৫০০ এজেন্ট নিয়ে স্পেশাল অপারেশন এগজিকিউটিভ (SOE) নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছিল। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিলেন নারী। সমগ্র 'ইউরোপে আগুন জ্বালিয়ে দেব,' এমন ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শত্রুর সীমান্ত রেখার ভেতরে প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া হল। জার্মান নাৎসী বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াইয়ের একটি অংশ হিসেবে এদেরকে অধিকৃত ফ্রান্সে পাঠানো হল।

নুর ইনায়েতকেও স্পেশাল এজেন্ট পদের ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এসওই অফিসে ডাকা হল। তাঁকে বলা হল যে, ট্রেনিংএর পর তাঁকে অধিকৃত ফ্রান্সে পাঠানো হব। সেখানে তার নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করা হবে না, ইউনিফর্ম পাবেন না এবং ধরা পড়লে জার্মান পুলিস তাঁকে গুলি করে মেরেও ফেলতে পারে। তবে একমুহূর্তও দ্বিধা না করে নুর জানালেন যে, তিনি এই দলে যোগ দিতে রাজি। পরবর্তীতে নুর এনায়েত খানকেও স্পেশাল অপারেশন এগজিকিউটিভের এফ (ফ্রান্স) সেকশনের জন্য নির্বাচিত করা হল। ১৯৪৩

সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে ব্রিটিশ এয়ারমিনিস্ট্রির ডাইরেকটরেট অব ইন্টেলিজেন্স-গুপ্তচর বিভাগে বদলি করা হল। ইংল্যান্ডের গিল্ডফোর্ডসহ আরো বিভিন্ন জায়গায় স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ (SOE) স্কুলে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল।

বাবা সুফি ইনায়েত খান এবং ছোট ভাই বেলায়েতের সাথে নুর ইনায়েত

অন্যান্য এফ সেকশন এজেন্টদের সাথে নুর ইনায়েত খানের প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হল ইংল্যান্ডের একটি বিমান ঘাঁটিতে। ৩০ মাইল বেগে ছুটে চলা একটি ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে কীভাবে মাটিতে গড়ান দিতে হয়, তা ওদেরকে শেখান হল। এরপর আরো উন্নত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে কেবল ৩০ সেকেন্ড সময় দিয়ে এজেন্টদেরকে ৫০০ ফুট উপর থেকে রাতের অন্ধকারে একটি বিমান থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামার প্রশিক্ষণ দেওয়া হল।

প্যারাসূট থেকে নিখুঁতভাবে লাফিয়ে নামা শেখানোর পর তাদেরকে খালি হাতে লড়াই, নিঃশব্দে শত্রুকে মেরে ফেলা, অস্ত্রের ব্যবহার এবং প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করে কীভাবে স্যাবোটেজ করতে হবে, তাও শেখানা হল। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে ছিল কোডের ব্যবহার, গোপন লিংক, সিন্দুক উড়িয়ে দেওয়া এবং দলিল জাল করার কৌশল।

প্রশিক্ষণের সময় তিনি 'নোরা বেকার' ছদ্মনাম নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তারা গোয়েন্দাগিরির কাজে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে মিশ্র অভিমত পোষণ করতেন/সন্দিহান ছিলেন এবং তাঁর ট্রেনিংও অসমাপ্ত ছিল। তবে ফরাসি ভাষায় চমৎকার দখল ছাড়াও ওয়্যারলেস অপারেটের হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া সেসময় অভিজ্ঞ সিক্রেট এজেন্টেরও অভাব থাকায়, তাঁকে নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সে অপারেশনের কাজে পাঠানো হল। ১৯৪৩ সালের ১৬/১৭ জুন কোড নাম 'ম্যাডেলিন'/ওয়্যারলেস অপারেটার/নার্স এবং জিন-ম্যারি রেইনার

পরিচয়ে এসিসট্যান্ট সেক্শন অফিসার নুরুন্নেসা ইনায়েত খানকে অন্ধকার রাতে এক ইঞ্জিনের একটি বিমানে চড়িয়ে উত্তর ফ্রান্সের একটি গোপন বিমানঘাঁটিতে নিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ফ্রান্সের এজেন্ট হেনরি ডেরিকোর্ট তাঁকে পথ দেখিয়ে প্যারিসে নিয়ে যান।

নুর ইনায়েতের সাথে আরো দুইজন নারী গুপ্তচর ছিল। ওরা ফ্রান্সিস সাটিলের নেতৃত্বে 'ফিজিশিয়ান নেটওয়ার্ক 'নামে একটি গোপন সংগঠনে যোগ দিলেন। তবে মাস দেড়েক পর এই ফিজিশিয়ান নেটওয়ার্কের সকল রেডিও অপারেটার জার্মান গেস্টাপো (SD) গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেল। এদের সাথে মিত্রবাহিনীর আরো কয়েক'শ প্রতিরোধ যোদ্ধাও গেস্টাপো বাহিনীর হাতে ধরা পড়লো।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ এফ সেকশনের প্রধান কর্নেল মরিস বাকমাষ্টার জানান যে, ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নুর ইনায়েত খান লন্ডন ফিরে আসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তবে SOE's গুপ্তচর চক্রের স্বার্থে তাঁর সেখানে থাকাটা অবশ্যই জরুরী ছিল। কেননা ইতিমধ্যে ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর সবচেয়ে বিশাল গুপ্তচর নেটওয়ার্ক জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর নুর ইনায়েত খানই ছিলেন তখন সেখানকার একমাত্র ওয়্যারলেস অপারেটার। তিনি সেখানে অবস্থান করে ব্রিটিশ গুপ্ত এজেন্টদের কাছ থেকে বার্তা সংগ্রহ করে রেডিও মারফত লন্ডন পাঠাতে থাকেন। তখন তিনিই ছিলেন প্যারিসে একমাত্র ব্রিটিশ এজেন্ট, যাকে জার্মান গেস্টাপো বাহিনীর এসডি অফিসাররা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করলো। তাঁর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে জার্মান সিকিউরিটি অফিসারদেরকে প্যারিসের বিভিন্ন সাবওয়ে স্টেশনে তল্লাসি করার জন্য পাঠানো হল। তাঁর খুব কাছেই জার্মান ওয়্যারলেস ডিটেকশন ভ্যানগুলো পিছু নেওয়ায় নুর এনায়েত এক জায়গায় কেবল বিশ মিনিট ধরে ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠাতে পারছিলেন। জার্মান গোয়েন্দা পুলিসের হাতে ধরা পড়া এড়াতে তিনি সারাক্ষণ জায়গা বদল করছিলেন। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেও লন্ডনের সাথে ঠিকই ওয়্যারলেসে যোগোযোগ রেখে চললেন: 'তিনি তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করতে রাজি হলেন না এবং একসময় তাঁর পদটি ফ্রান্সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক পদ হয়ে দাঁড়াল। তবে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাঁর কাজ করে চললেন।' নুর তখন একাই ছয়জন অয়্যারলেস অপারেটারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

গ্রেপ্তার এবং বন্দি

নুর এনায়েতের সাথে সম্ভবত হেনরি ডেরিকোর্ট অথবা রেনে গ্যারি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ফরাসি বিমানবাহিনীর প্রাক্তন পাইলট ডেরিকোর্ট

একজন SOE অফিসার ছিলেন, তবে ধারণা করা হয় যে একজন ডাবল এজেন্ট হিসেবে তিনি জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীরও হয়েও কাজ করতেন।

১৩ অক্টোবর ১৯৪৩ সালে নুর এনায়েত খান জার্মান (SD) গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন এবং তাঁকে প্যারিসের ৮৪ এভিনিউ ফচএ এসডি বাহিনীর হেডকোর্য়াটারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। যদিও তাঁর নিজের SOE প্রশিক্ষকরা তার নরম আচরণ এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের কারণে এই কাজে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তবে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় দেখা গেল তিনি প্রচন্ডভাবে লড়াই করেছিলেন। জার্মান এসডি অফিসাররা তাকে রীতিমত ভয় পেত। এরপর থেকেই ওরা তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন বন্দি বিবেচিত করতো। তাঁকে অত্যাচার করা হয়েছিল কী না, সে বিষয়ে নিরেট কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তাঁকে এক মাসের উপর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেইসময় তিনি দুইবার পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধের পর প্যারিসে জার্মান গোয়েন্দা এসডি বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান হান্স কেইফার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, নুর এনায়েত গেস্টাপো বাহিনীকে কোন তথ্য দেননি, তিনি অবিরাম মিথ্যা বলে চলেছিলেন।

অবশ্য নুর ইনায়েত তার কর্মকান্ড সম্পর্কে মুখ না খুললেও, জার্মান এসডি গোয়েন্দা বাহিনী তাঁর ডায়েরিটা ঠিকই খুঁজে পেয়েছিল।

গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারে বন্দি থাকা অবস্থায় সঙ্গি আরো দুই এসওই এজেন্ট জন রেনশ স্টার এবং লিওন ফায়েকে সাথে নিয়ে নুর ইনায়েত ২৫ নভেম্বর ১৯৪৩, এসডি হেডকোর্য়াটার থেকে পালালেন। তবে ওরা বেশিদূর যেতে পারলেন না, জার্মান গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারের প্রাঙ্গণেই ওরা আবার ধরা পড়লেন। যখন ওরা ছাদের উপর দিয়ে পালাচ্ছলেন, যখন বিমান হামলার সাইরেন বেজে উঠেছিল। রেগুলেশন অনুযায়ী এমন সময়ে বন্দিদের সংখ্যা গণনা করার নিয়ম থাকায় বন্দীশিবির থেকে ওদের পালাবার বিষয়টি আবিষ্কার হয় এবং ওরা ধরা পড়েন।

ভবিষ্যতে আর পালাবার চেষ্টা করবেন না, এইমর্মে একটি ঘোষণায় সই দিতে রাজি না হওয়ায়, এরপর নুর ইনায়েতকে ১৯৪৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর জার্মানিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তথাকথিত 'নিরাপদ কাস্টডি'র জন্য তাকে জার্মানির ফর্টশেইম শহরে একটি নির্জন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। অত্যন্ত গোপন জায়গায় তাঁকে বন্দি করে রাখা হল, যেন কেউ তার হদিস না পায়। সেই নির্জন সেলে দশ মাস তাকে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছিল।

'অত্যন্ত বিপজ্জনক' শ্রেণীভুক্ত করে তাঁকে অধিকাংশ সময় শিকলে বেঁধে রাখা হতো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ঐ কারাগারের পরিচালক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, নুর ইনায়েত খান সবসময় অসহযোগী মনোভাব দেখাতেন এবং তাঁর কর্মকান্ড এবং তাঁর সহকর্মী অন্য এজেন্টদের সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে রাজি হননি। ঐ নির্জন কারাগারে বন্দি থাকার সময় আশেপাশের বন্দিরা অনেক সময় রাতে তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন। তবে মেসে ব্যবহৃত কাপের নিচে হিজিবিজি দুর্বোধ্য অক্ষরে লিখে তিনি আরেক বন্দিকে, তাঁর নোরা বেকার নাম এবং তাঁর মায়ের লন্ডনের ঠিকানাটা জানিয়েছিলেন। ব্লমসবেরির ৪ ট্যাভিটন স্ট্রিটে ঐ বাড়ির সামনে গত ২৮ আগষ্ট, ২০২০ একটি স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হয়েছে।

জর্জ ক্রস

ফ্রান্স সরকার কর্তৃক নুর ইনায়েত খানকে প্রদত্ত সামরিক মেডেল

১৯৪৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আরো তিনজন এসওই এজেন্টসহ নুর এনায়েত খানকে কার্লসরুহে কারাগার থেকে কুখ্যাত ডাখাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প স্থানান্তর করা হয়। বাকি তিন এজেন্টের নাম ছিল জোলান্দা বিকম্যান, এলিয়েন প্লিউম্যান এবং ম্যাডেলিন ডেমারমেন্ট। ১৩ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় মাথার পেছনে গুলি করে ঐ চার নারী বন্দিকে হত্যা করা হয়। এরপর তাদের মরদেহ সাথে সাথে ক্রিমেটোরিয়ামে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তবে ১৯৫৮ সালে একজন ডাচ বন্দী জানান যে, উইলহেল্ম রুপার্ট নামে উচ্চপদস্থ একজন এসএস অফিসার নুর এনায়েত খানের উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালিয়ে, তারপর পেছন দিক থেকে তার মাথায় গুলি করেছিল; যদিও আসলে তার মৃত্যুর কারণ ছিল অত্যধিক দৈহিক নির্যাতন। এমনকি কারাগারে বন্দি অবস্থায় তার উপর যৌন নির্যাতনও করা হয়ে থাকতে পারে। মৃত্যুর আগে তার শেষ কথা ছিল, 'লিবার্টি-মুক্তি'।

মহিয়সী এই নারীকে তাঁর আত্মত্যাগ এবং বীরত্বসূচক কর্মের জন্য ফরাসি সরকার ১৯৪৬ সালের ১৬ জানুয়ারি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক রূপালি তারাসহ একটি ক্রস দ্য গ্যোর বা সামরিক মেডেল দেন। এর তিন বছর পর ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৯ সালে মরণোত্তর জর্জ ক্রস পদকে ভূষিত করেন। দুটোই ছিল সর্বোচ্চ বেসরকারী পদক। যেহেতু ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাকে 'মিসিং' বিবেচিত করা হয়েছিল, সেজন্য তাকে মেম্বার অব দি অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এমপায়ারের জন্য তার নাম তখনও বিবেচিত করা হয়নি, তবে অক্টোবর ১৯৪৬ সালের ডিসপ্যাচে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। নুর এনায়েত খান ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন সদস্যের একজন, যাদেরকে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক দেওয়া হয়।

২৮ আগষ্ট ২০২০, লন্ডনের ব্লুমসবেরিতে ৪ ট্যাভিটন স্ট্রিটে নুর ইনায়েতের বাড়িতে একটি ফলক বসানো হয়

সেন্ট্রাল লন্ডনে তার বাসস্থানের কাছেই তাঁর স্মরণে একটি ব্রোঞ্জের আবক্ষ মুর্তি গড়ার জন্য ২০১১ সালে এক লক্ষ পাউন্ড তহবিল গঠনের জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটিই ছিল একজন মুসলিম নারী অথবা একজন এশীয় নারীর জন্য প্রথম স্মৃতিসৌধ। তবে নুর এনায়েত খানের নাম ইতিপূর্বেই লন্ডনের নাইটব্রিজের সেইন্ট পল চার্চে FANY বা ব্রিটিশ নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেমোরিয়ালে তুলে ধরা হয়েছিল। ঐ তালিকায় কোরের ৫২ জন নারী স্বেচ্ছাযোদ্ধার নাম ছিল, যারা যুদ্ধের সময় দায়িত্ব পালনকালে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

তাঁর স্মরণে নির্মিত ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি ৮ নভেম্বর ২০১২ সালে প্রিন্সেস অ্যানি উন্মোচন করেন।

এছাড়া ২৫ মার্চ ২০১৪ সালে নুর এনায়েত খানের স্মরণে একটি ডাকটিকিট উদ্ধোধন করা হয়। এই ডাক টিকিটটি 'রিমার্কেবল লাইফ' সিরিজের একটি ডাকটিকিট ছিল।

উল্লেখ্য যে, জর্জ ক্রস পদকের ঘোষণাটি ৫ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে লন্ডন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ণ বিবরণটি এভাবে তুলে ধরা হয়েছিল:

রাজা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই মরণোত্তর জর্জ ক্রস পদকটির অনুমোদন দিলেন:-

এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার নোরা এনায়েত খান (৯৯০১), ওমেন অগজলারি এয়ারফোর্স।

ঐ ঘোষণায় শত্রু অধিকৃত ফ্রান্সে নুর এনায়েতের কর্মকাণ্ডের বিশদ বর্ণনা এবং গেস্টাপো বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হয়:

এসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার নোরা এনায়েত খান ছিলেন প্রথম নারী অপারেটার, যিনি গোপনে শত্রু অধিকৃত ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করেন এবং একটি লাইস্যান্ডার বিমান যোগে ১৬জুন ১৯৪৩ সালে তাকে সেখানে অবতরণ করা হয়। তাঁর সেখানে পৌঁছার কয়েক সপ্তাহ পর জার্মান গেস্টাপো বাহিনী প্যারিস রেজিসটেন্স গ্রুপকে গণহারে গ্রেপ্তার শুরু করে। নুর এনায়েতকে ঐ রেজিসট্যান্স গ্রুপের সাথে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি অবশ্য তার দায়িত্ব ছেড়ে আসতে রাজি হননি। তাঁর কাজটি ঐ সময় ফ্রান্সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তাকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হলেও, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা তিনি তার ফরাসি কমরেডদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছেড়ে আসতে চাননি এবং আশা করেছিলেন সেখানে নতুন একটি দল গড়ে তুলবেন। অতএব তিনি সেখানে তার পদে রয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত চমৎকার কাজ করতে থাকলেন, যার ফলশ্রুতিতে ডেসপ্যাচে তার নাম মরণোত্তর উল্লেখ করা হয়।

গেস্টাপোর কাছে তাঁর চেহারার পূর্ণ বিবরণ ছিল, তবে ওরা কেবল তাঁর 'ম্যাডেলিন' কোডনামটি জানতো। তাঁকে ধরার জন্য প্রচুর গোয়েন্দা অফিসার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছিল, যাতে লন্ডনের সাথে ফরাসি প্রতিরোধ সেনাদলের সর্বশেষ যোগাযোগের সূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। তবে তিন মাস পর একজন বিশ্বাসঘাতক নারী কর্মী তাঁকে গেস্টাপোর কাছে ধরিয়ে দেয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্যারিসের ফচ এভিনিউয়ে অবস্থিত গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। গেস্টাপো এজেন্টরা তাঁর কোড এবং মেসেজগুলোও খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। ওরা নুর এনায়েতকে তাদের সাথে

সহযোগিতা করতে বললেও, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদেরকে কোন ধরনের তথ্য দেননি। গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারের ৫ তলার একটি সেলে/কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। সেখানে তিনি কয়েক সপ্তাহ বন্দি ছিলেন, তবে এর মধ্যে দুইবার পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আর পালাতে চেষ্টা করবেন না, এই মর্মে তাকে একটি ঘোষণাপত্রে সই করতে বলা হয়, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তথাকথিত 'সে্ইফ কাস্টডির' জন্য তাকে জার্মানি পাঠাবার স্থানীয় গেস্টাপো বাহিনী প্রধান বার্লিন থেকে অনুমতি চান। তিনিই প্রথম এজেন্ট, যাকে জার্মানি পাঠানো হয়েছিল।

জার্মানির কুখ্যাত ডাখাউ কনসেট্রেশন ক্যাম্পের যেখানে নুর ইনায়েতকে গুলি করে মেরে, শব দাহ করে ফেলা হয়েছিল, সেখানে একটি স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হয়েছে

এসিসট্যান্ট সেকশন অফিসার নুর এনয়েত খানকে নভেম্বর ১৯৪৩ জার্মানির কার্লসরুহে পাঠানো হয়, সেখান থেকে তাঁকে আবার ফরঝেইম শহরের একটি নির্জন কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অসহযোগী বন্দী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যুদ্ধের পর প্রিজন ডিরেক্টরকে

জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি নিশ্চিত করেন যে, এসিসট্যান্ট সেকশন অফিসার নুর এনায়েতকে কার্লসরুহের গেস্টাপো এজেন্টরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তিনি তার কাজ অথবা তার সহকর্মীদের সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে রাজি হননি।

আরো তিনজনের সাথে তাঁকে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ ডাখাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছার পর তাকে শবদাহন চুল্লীর কাছে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

এসিসট্যান্ট সেকশন অফিসার নুর ইনায়েত খান বারো মাসেরও বেশি সময় ধরে চোখে পড়ার মত নৈতিক ও দৈহিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর মুখ থেকে শেষ কথাটি ছিল 'লিবার্টি-মুক্তি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর।

তার জীবন কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছেঃ

১. *স্পাই প্রিন্সেস: দি লাইফ অব নুর ইনায়েত খান*- শ্রাবনি বসু

২. *কোড নেইম ম্যাডেলিন: এ সুফি স্পাই ইন নাজি-অকুপাইড প্যারিস*– আর্থার জে. মাগিদা

৩. *নুরুননিসা ইনায়েত খান: ম্যাডেলিন: জর্জ ক্রস এমবিই*– জিন ওভার্টন ফুলার

৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ আমেরিকান কবি স্ট্যাসি এরকিসন তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছেন, যারা শিরোনাম ছিল, '*Resistanc* '। এটিই ছিল নুর এনায়েত খানের স্মৃতির উৎসর্গকৃত প্রথম কবিতা।

২০১৩ সালের ৩ মার্চ অপর আরেক আমেরিকান কবি ইরফানউল্লা শরিফ '*এ ট্রিবিউট টু দি ইলুমিনেটেড ওম্যান অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২*' নামে একটি কবিতা নুর এনায়েত খানের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করেন।

নুর ইনায়েত খানের জীবন নিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রামঃ

১. *"Enemy of the Reich: The Noor Inayat Khan Story" PBS stations nationwide on Tuesday, September 9th.2014.*♦

সূত্রঃ স্পাই প্রিন্সেস: দি লাইফ অব নুর ইনায়েত খান, শ্রাবনি বসু। দি ইনডিপেন্ডেন্ট, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, 'মিট দ্য মুসলিম হু স্যাক্রিফায়েড দেমসেল্ভস টু সেভ যিউ এন্ড ফাইট নাজিস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২, 'মাইকেল ওল্ফ, দি ওয়াশিংটন পোস্ট, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

ছায়াসঙ্গী

সোহরাব পাশা

খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায় স্মৃতির মুদ্রা
মুগ্ধকালের উপমা
মনে পড়ে না প্রথম কবে হেসে ছিল নীলিমা

নিবিড় প্রিয়সব গল্পের দ্বিতীয় মুদ্রণ করে
গোধূলির জন্মান্ধ কুয়াশা
মানুষ দাঁড়িয়ে সুন্দরের দীর্ঘ চলে যাওয়া দেখে

নিয়ত মানুষ ভুলে যেতে যায় নিঃসঙ্গ বেদনা

সবাই পেতে চায় নিভৃত বাসনার প্রতিশ্রুতি
গোপন পিপাসার নিবৃত্তির উত্তাপ
লাবণ্যের ছায়ার আড়ালে

এ চোখ সব সময় সত্যিটা দেখে না
যদিও চোখ জানে এক বর্ণও ভুল দেখার নেই
বস্তুত চূড়ান্ত ভেতর দেখার উপমা নেই মানুষের
তার দেখা অর্ধসত্য– না হয় তা সত্যের মতোন
ঘোরের গূঢ় রসায়নে স্বপ্নেরা হাঁটে ভুল পথে

তাই দুঃখগুলো মানুষের ছায়াসঙ্গী
প্রিয় গোলাপের ছায়ায় ফোটে।

বকধার্মিক

নীহার মোশারফ

পথিক হারালে পথ কিছুটা ভড়কে যায়
অন্ধকারে ডুব দিয়ে আলোর চাহিদা বোঝে
খুব প্রয়োজন হয় তখন সত্যের বাণী
মৃত্তিকা সমান হলে হাঁটতে ভালো লাগে
কালো টাকা রোজগারে ঝামেলা যত
কত পুরুষ বীর সেজেও সুখের ছোঁয়া
থেকে দূরে ছিলেন যুগের পর যুগ
আল্লাহর নিশান সোজাসাপটা ভেদে
আঁকাবাঁকা গলি কম, শান্তির পরশ
তবুও মানুষ ভুলে যায় সব, অহংকারে
রূপোলি নদীর বাঁকে হাত তোলে কারা?
চোখে ধাঁধা নেই, মহিমা মাগে তাঁর। শুধু
ইতস্তত ভবিষ্যতের দীর্ঘশ্বাসে বকধার্মিক যারা
স্বপ্নের বীজ বোনে, মরীচিকায় সাঁতরায়।

১৯৭৫ এবং আজ

সৌম্য সালেক

স্বপরিবারে হত্যা শেষে, বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম যারা চিরতরে মুছে দিতে চেয়েছিল
মোস্তাক, রশিদ, ডালিম আরও কিছু সীমারের নাম
একুশ শতকের এই উদ্দীপ্ত সময়ে একদিন অকস্মাৎ তারা ফিরে এলো ঢাকায়
৩২ নম্বরে, শাহবাগে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অলিন্দে
ওরা কেবল এদিক ওদিক দেখছিল একযোগে
ফিরে ফিরে মানুষের মুখের দিকে তাকাচ্ছে
কথা শুনছে:
পথে-ঘাটে দৃশ্যে-পরিপার্শ্বে সবখানে আজ গণরবে ধ্বনিত হচ্ছে শেখ মুজিবের নাম
চর্চিত হচ্ছে তার গুণ ও বচন।
ওরা দেখলো, শেখ মুজিব বেঁচে আছেন বাঙালির হৃদয়ে
মুখে মুখে জীবনের জয়-জাগরণে
তাঁর যাপিতদিনের চেয়ে আরও বেশি অর্থময় আবাহনে
ওরা আরও দেখলো, নিজেদের নামের পাশে জমে আছে ঘৃণার পাহাড়
উৎকট আবরণে ঢেকে আছে তাদের তলাট!
ক্ষমাহীন-ছন্দহীন বিরাণ আজ তাদের বসতী!

তোমার দয়ালু প্রভাব

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

সাগর পাড়ি দিতে দেখেছি অজস্র ফেনিল ঢেউ
আছড়ে পড়েছে জাহাজের শক্তপাতে। কখন
ছিঁড়ে গেছে হাওয়ার পাল। ডুবতে ডুবতে
বেঁচে গেছি আমরা ক'জন দুঃসাহসী নাবিক।

সবুজ প্রান্তরে হাঁটতে গিয়ে দেখেছি বাধার প্রাচীর
অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে আমাদের গন্তব্য পথ
ভীষণ কালো বাঘেরা থাবা উঁচিয়ে আসছে তেড়ে
মরতে মরতে বেঁছে গেছি আমরা দিশেহারা মানুষ।

পাহাড়ে টিলায় ছিলো আমাদের রঙিন রঙিন স্বপ্ন
হিমবাহে সেই সব স্বপ্ন ঢাকা পড়েছে বরফের নিচে
তবুও আমরা শক্ত সোপান ভেঙে উঠছি আকাশে
এবারে আমরা দাঁড়িয়েছি তোমার অশেষ দয়ায়।

সমার্থক

মনির হোসেন

শাহাদাতের শেষ ঝাঁকুনি দেয়ার আগে
রক্তে লাল ক্ষত চেপে বললেন–
আমার নাম বরকত, লাশটা... পৌঁছে দিয়েন।
সেই থেকে বরকত আর বাংলাভাষা এক হয়ে ওঠে,
ক্যাম্পাসের কৃষ্ণচূড়া শিমুল পলাশ আরো লাল হয়ে ফোটে।

... এরপর কত কী হয়ে গেল,
বাংলা ভাষার বাংলা একাডেমি এল,
জাতির জনক হয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু–
এলো মহান স্বাধীনতা
তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে স্বাবলম্বী দেশ;
... তারপর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেল।

বঙ্গবন্ধু বাংলাভাষা এবং বাঙালি একই
সমার্থক– ত্রিপাঁপড়ি গোলাপের মতই।

চির অম্লান

আব্দুল হাই মোল্যা

স্বাধিকার বাগানে ফোঁটা চারটি ফুল
তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী আর নজরুল।
তাঁরা ছিল নেতার অতি আপনজন
ছিল বিশ্বস্ত ও আস্থা ভাজন।
নেতার নির্দেশনা মেনে চলত সারাক্ষণ
দেশ সেবার কাজে পড়ে থাকত মন।
নেতার মাঝে নিজেদের দিয়েছে বিসর্জন
সোনার বাংলা গড়তে হবে এই ছিল পণ।

জাতির পিতাকে ঘিরে
হিমালয় সমছিল চার তরবারি।
ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল নেতার জীবন।
তাদের দৃঢ় শপথ শত্রুর সাথে আপোষ নহে কখন।
রক্ত দিয়ে শুধব রক্ত ঋণ।
বাংলার আকাশে স্বাধীকার পতাকা রাখবো চিরউড্ডীন।
করতে তাদের নিস্তার ভরল কারাগারে।
তেসরা নভেম্বরে নিশার আঁধারের
হায়েনারা হন্তিল জাতির চার সন্তানেরে।

হে জাতির বিবেক জাতীয় চার সন্তান।
তোমরা চির স্মরণীয় চির বরণীয় চির অম্লান।
তোমারা যে বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ।
বাঙালি জাতি গাইবে তোমাদের জয় গান
আমরা উত্তরাধিকার তোমাতে হব বিলীন।
একদিন শুধব তোমাদের রক্তের ঋণ।

একটি পাহাড়ের গল্প

সাম্মি ইসলাম নীলা

শুনেছি মণিমুক্তা খচিত অনেক অজানা পাহাড়ের গল্প। এমন পাহাড় নয়, যেখানে ফুল ফোটে না, পাখিরা গান করে না; পাদদেশের গাছপালার মায়াবি করুণ চাহনি দেখে– শুকিয়ে যাওয়া সবুজ ঘাসের অভিমান; পর্যটকরা জানতে পারে না, পুরাতন পাহাড়টির নাম।

বৃষ্টির সাথে পাহাড়ের আড়িপাতার গল্পসন্ধ্যার বন্দোবস্ত হয়েছিল পূর্ব জন্মেরও ন'শত ছিয়ানব্বই বছর আগে– সেদিন আমার আর্তনাদ ঘিরে ঘুমের পিরামিড বানিয়েছিল পাহাড়। মধ্যরাতে ঘুমের পিরামিড ভেঙে পাহাড়ের সরু পথ ধরে– নীল প্রজাপতির মেলা দেখব ভেবে হাঁটছিলাম। আমি দু'হাতে প্রজাপতি সরিয়ে সামনে পালিয়ে যাব ভেবে, ওরা আমাকে অতি আপনের মতো জড়িয়ে ধরছিল।

আকাশের অস্থিরতা কেটে একটি গাঢ় নীল শাড়ি উড়ে এসে আমার শরীর জড়িয়ে ধরল। আমি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে– যেখানে পাখিরা গান করে, মুক্তমনে প্রজাপতি ওড়ে– সবুজ গাছের ডালে বহুকালের ঝুমবৃষ্টি নামে আকাশের বুক চিরে।

ভেজা শরীর গাঢ় নীল শাড়ি জড়িয়ে মৃদু বাতাসে শাড়ির আঁচল অন্য গ্রহে উড়ছে; আমার পেছন পেছন এক রাজকুমারকে আসতে দেখে পাহাড় চীৎকার করে বলল– আমি নীল প্রজাপতির পাহাড়।

লাল সিগন্যাল

মারইয়াম মনিকা

রাত্রি হলেই আমি জেগে উঠি
পৃথিবীর তাবৎ রং মিশিয়ে আঁকতে চাই জীবনের উন্নত শির,
কিংশুকের ডালে ল্যাম্পপোস্টের মতো ঝুলে থাকা মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ
রাতের তামাশা ছুড়ে ফেলে তাকিয়ে থাকে অস্থির চোখে,
কী ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, কণ্ঠে প্রতিবাদের শ্লোগান
আগুনের মতো কঠিন শপথ, স্ফীতমেদ সমাজে
সুশাসনের তরঙ্গবেগ, সৈনিক কণ্ঠে ত্রাসের আকণ্ঠ উদ্বেগ
মধ্যরাতে জ্বালিয়ে দেয় লাল সিগন্যাল।

ট্রেনের হুইসেলে কাঁপে অসাড় রাতের ঝিমধরা স্টেশন
গাঢ় অন্ধকারে চাপা পড়ে পাগলের প্রলাপ
বরফ জলে দাঁড়িয়ে নিশি যাপন করে যুদ্ধের ঘোড়া
ঝিঁঝিপোকার আলোর মতো জ্বলে আর নেভে সত্য মিথ্যার চাঁকা।

চির- সমুজ্জ্বল জীবনের তপস্যায় এ প্রাণের আবির্ভাব
রক্তচোষা ঠোঁটে 'না' এর সিলমোহর শিরোধার্য,
আমি পৌরসভার ঝাড়ুদারের মতো কুঁড়োতে থাকি সবুজ স্বপ্ন
কিন্তু দূর-বহুদূরে ঐ শালবনে কারা যেন জ্বালাতে চায় লাল সিগন্যাল।

যে রাত খুন হয়েছিল গরাদে

শামস সাইদ

নভেম্বরের বিকেলটা ভেঙ্গে পড়েছে মাটির গায়ে। লাল হয়ে গেছে আকাশ। তার শরীর রক্তে মাখা। সূর্য ঝুলে আছে ফাঁসির রশিতে। প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়েছেন নামাজে। দিনের শেষ নামাজ। ওয়াক্তের শেষ মুহূর্ত। সেই কক্ষে খানিক দূরে বসে আছে কর্নেল ফারুক। প্রেসিডেন্টকে দখল করেছে তারা। সেই সকালের নির্মম ট্রাজেডির পরে প্রেসিডেন্টের আসনে বসেছেন মোশতাক। খুব খায়েশ ছিল এই আসনে বসার। কিন্তু সেই সকালে তার উত্তেজনা হারিয়ে গিয়েছিল। অনেকটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটা গাড়ি থামল তার বাড়ির দরজা বন্ধ করে। নেমে এলো একজন বিপথগামী সেনা অফিসার। অন্যরা

ঘিরে ফেলল বাড়ি। যারা খানিক আগে এক নির্মম ইতিহাসের জন্ম দিয়ে সপরিবারে রাষ্ট্রপতিকে খুন করে এসেছে। তার লাশ পড়ে আছে সিঁড়িতে। অফিসার ঢুকল বাড়ির ভেতর। মোশতাক তখন ভেতরঘরে। সামনে আসতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। খুব প্রস্রাব চাপছিল তার। অফিসারের কথা শুনে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন টয়লেটে। অফিসার অস্থির। কেন দেরি করছেন। মোশতাক বের হতে চাচ্ছেন না। তার স্ত্রী কয়েকবার নক করেছেন দরজায়। এরপর বেরিয়ে এলেন। শরীর কাঁপছে। সামনে যেতে হবে। এড়িয়ে যেতে পারবেন না। নিজেকে স্থির রাখার অভিনয় করছেন। ধীর পায়ে বেজার মুখে এলেন সামনের ঘরে। ভেতরের অবস্থা নড়বড়ে। অফিসার দাঁড়াল তার সামনে। বলল, আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সুযোগ নেই। যেতেই হবে। ভেতরঘরে গেলেন আবার। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এলেন মোশতাক। অফিসার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল বঙ্গভবন। শপথ পরিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতির। এভাবেও রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়। অবাক বিষয়। সেই থেকে দখল হয়ে গেছেন তিনি। দেশ দখল করে মানুষ, দখল করে চেয়ার। বিতর্কিত অফিসাররা দখল করল রাষ্ট্রপতি। ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। মৌমাছির মতো ঘিরে রেখেছে। পুতুল রাষ্ট্রতি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছে তাদের মত।

দুমাস আঠারো দিন প্রেসিডেন্ট অসুখে ভুগছেন মোশতাক। এই অসুখ থেকে আরোগ্য কামনা করছেন বারবার। প্রার্থনায় রাখেন মুক্তির দরখাস্ত। গত রাতে মিলিত হয়েছিলেন মিটিংয়ে। সেদিনের পর থেকেই বিতর্কিত সেনা অফিসাররা একটা শঙ্কায় ভুগছে। সেটা আর একটা বিপ্লবের। সেই বিপ্লব তাদের পতন ঘটাবে। নেতৃত্ব চলে যাবে আওয়ামী লীগের কাছে। কারা আসতে পারে নেতৃত্বে? প্রশ্ন ছিল ফারুকের।

প্রেসিডিন্টে বলেছিলেন চারটা নাম। এই চারজন মুজিবের অংশ। সাড়া দেয়নি তাদের ডাকে।

গত রাতের মিটিংয়ে গুরুত্ব পায়নি প্রেসিডেন্টের বক্তব্য। সিদ্ধান্তের চাবি বিতর্কিত অফিসারদের হাতে। সময় মতো তালাটা খুলে দিতে হবে প্রেসিডেন্টকে। নামাজে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের মনে পড়ছে সেই কথা। বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সূরা। হারাচ্ছেন একাগ্রতা। আলামতারা কাইফা ফাআলা পড়তে গিয়ে তিনবার কাইছা ছাআলা পড়েছেন। আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে। আজরাঈলের মতো খানিক দূরে বসে আছে কর্নেল। ওটাও ভয়ের একটা কারণ। যার মাথায় চেপে আছে খুন। যাকেই বিপদ মনে করছে তাকেই খুন

করবে। খুন করে নিজেদের নিরাপদ রাখতে চাচ্ছে। কাল রাতে যে মিটিং হয়েছে সেটাও একটা খুনের। একটা রাতকে খুন করবে। যে রাত গরাদে বন্দী। থাকবে ঘুমিয়ে। সম্মতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনিও চাচ্ছেন রাতটা খুন হোক। না হয় বিপদ তাকে গ্রাস করবে।

চাপানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল মেজর রশিদ। দেখল প্রেসিডেন্ট প্রার্থনায় মগ্ন। ওখানে দাঁড়িয়ে মুখ বাকাল। প্রার্থনা করছেন। চোখের ইশারায় ভেতরে আসতে বলল কর্নেল।

মেজর গিয়ে দাঁড়াল কর্নেলের পাশে। প্রেসিডেন্টের নামাজ আটকে যাচ্ছে। শেষ করতে পারছেন না। সন্ধ্যা নেমে পড়বে তখন। মেজর হাসল। তাচ্ছিলের কণ্ঠে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, এত প্রার্থনা করে কেন? ভয় পেয়েছে নাকি?

অসহায় হয়ে পড়েছেন।

না, আমাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা।

হাসল কর্নেল। যার অস্তিত্ব আমরা। সে আমাদের থেকে আলাদা থাকতে পারবে না। দূরে থাকা দূরের কথা।

মেজর বলল, পরিস্থিতি ভালো না। যেটা ভাবছিলাম সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের চিন্তা। আজ রাত হতে পারে বিদ্রোহের। গোপন খবর এসেছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। প্রথমেই ওরা চাইবে রাষ্ট্রপতির আসন দখল করতে। তারপর খুলে দিবে কারাগারের কপাট। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী নেতারা বেরিয়ে এলেন জনগণ সংগঠিত হবে। সমস্ত প্ল্যান মাটি হয়ে যাবে। সৈনিকরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসতে পারে। অধিকাংশ অফিসারও সেই মতের। আমাদের ক্ষমতার একমাত্র ঘুটি প্রার্থনায় রত। এর বাইরে গুলিহীন অস্ত্রের মতো। এমন কিছু হলে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

আর্মির ব্রিদোহ থামিয়ে দিতে পারব। আওয়ামী লীগ নিয়ে ভয়। সংগঠিত হতে দেওয়া যাবে না। আজ রাতেই সেই সম্ভাবনা শেষ করে দিতে হবে। বলল কর্নেল।

খালেদ মোশাররফ সফল হলে আওয়ামী লীগ সংগঠিত হয়ে যাবে। বিচারের মুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। ছেড়ে দেবে না। এই মুহূর্তে সেনা অভ্যুত্থান ঠেকানো কঠিন হবে। জিয়াউর রহমানের পক্ষ নিতে পারি আমরা। তাহলে নিরাপদ থাকব। সেটা এখন জরুরি।

নামাজ শেষ করে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। মেজর এসে সামনে দাঁড়াল। ব্যাঙ্গাত্মক মুখে বলল, আজই দখল হয়ে যেতে পারে বঙ্গভবন। ভাবছেন কী হবে আপনার পরিণতি।

বিচলিত হলেন প্রেসিডেন্ট। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। তাড়াহুড়ো করে শুকনা গলায় প্রশ্ন করলেন, কারা এমন দুঃসাহস দেখাতে চাচ্ছে? তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

পারবেন না। ঠোঁট বাকিয়ে বলল মেজর।

থেমে গেলেন প্রেসিডেন্ট। কিছুটা ভয় ঢুকে পড়ল তার বুকে। মেজর বলল, ঠেকানোর একটা কৌশল আছে। যেটা কাল রাতে ভেবে রেখেছি আমরা। সেটা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। দেরি করলে মসনদ ভেসে যাবে। আর আপনি! কী ভাবছেন দাঁড়িয়ে থাকবেন? এরপর ভাবতে পারছি না আমি।

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে হবে। প্রকৃত আওয়ামী লীগাররা আমার সাথে আছে। বাকিরা দুশমন। মেরে ফেল। ওই চারজনকে মেরে ফেললে পাল্টা অভ্যুত্থান হলেও সেটা রাজনৈতিক সমর্থন পাবে না। বলে হনহনিয়ে অফিস রুমে ঢুকে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। খুক খুক করে কাশলেন। শরীরটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার চেয়ার উত্তাপ বাড়াতে পারেনি। এ কোন আসনে বসলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

কর্নেল হাসল। মেজরকে নিয়ে দাঁড়াল লনে। সিগারেট জ্বালাল। সিগারেট টেনে চিন্তার একটা প্রান্ত স্পর্শ করল তারা। তখন ক্যাপ্টেন মোসলেম এলো। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গরাদে রাতকে খুন করার। মুখ ঘুরাল কর্নেল। দেখল ক্যাপ্টেন বিধ্বস্ত। জানতে চাইল কী হয়েছে? কেন এতটা বিচলিত।

ক্যাপ্টেন বলল, ঢাকার অবস্থা ভালো না। বিদ্রোহী সেনারা বেরিয়ে আসতে পারে। সেটা আজ রাতেই। সে সম্ভাবনা প্রবল।

কর্নেল বলল, ধাপে ধাপে আগাতে হবে। হুড়স্থুল করে মাথা এলোমেলো করা যাবে না। প্রস্তুত থাক। রাতের শেষভাগে কারাগারে যাবে। ওটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব তোমার। এদিকটা আমরা দেখব। অভ্যুত্থান ঠেকাতে দরকার হলে পাল্টা অভ্যুত্থান হবে।

প্রেসিডেন্ট অনুমতি দিয়েছেন?

হুম। না দিয়ে যাবেন কোথায়? তার অস্তিত্বের খুঁটি আমরা। সিগারেটে টান দিয়ে বলল কর্নেল।

মাথা নেড়ে সিগারেট জ্বালাল ক্যাপ্টেন। মনে তার প্রবলভাবে চেপে আছে আরও একটা খুন।

২

কারাগারের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছেন তাজউদ্দীন। ফুল বাগান করেছেন। সেই বাগান তার সামনে। ফুল ফুটেছে গোলাপ গাছে। তবে মন তার দখল

করেছে দুশ্চিন্তা। ভাবেননি স্বাধীন দেশে আবারও কারাগারে আসতে হবে। সেই সকালের পরে গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। গ্রেপ্তার এড়াতে পারতেন। কিন্তু আদর্শ বিকিয়ে দিতে চাননি। বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রবল শ্রদ্ধা তার, সেখান থেকে সরে আসতে পারেননি। তখনই সন্দেহটা ধরা পড়ল মোশতাকের মনে। এরা সাড়া দেয়নি তার ডাকে। তাই কারাগারে ঠাঁই হলো তাজউদ্দীনের। স্মৃতির মিনারে ভেসে উঠল সেই দিনগুলো। বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারে কাটিয়েছেন দিনের পরে দিন। গল্প আড্ডায় হারিয়ে গেছে তাদের কত বেলা। সংগ্রামের পথে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর পা। শেষ জীবনে দূরত্ব বেড়ে গেল অনেকটা। যা ছিল ভাবনার বাইরে। বঙ্গবন্ধু হারিয়ে গেছেন। আর দেখা হবে না। নিরবে কাঁদেন তাজউদ্দীন। সে চোখের জল কেউ দেখে না। বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একা। একাই ভালো লাগে। একটা প্রজাপতি এসে ফুলে বসল। সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তখন একটা পায়ের আওয়াজ। মাথা ঘুরালেন। দেখলেন প্যাটেল। সাইদুর রহমান প্যাটেল।

সেই সকালের পরে সাইদুর রহমান প্যাটেলও এসেছেন কারাগারে। তার জায়গা হয়েছে মনসুর আলীর কক্ষে। আব্দুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবন্ধুর বোন জামাই সৈয়দ হোসেন, মতিঝিলের এমপি শামীম মিসির, জোহা সাহেব, রংপুরের আজহার এমপি, শ্রমিক নেতা মোজাম্মেল, আমির হোসেন আমুসহ সতেরো জনের বাস সেই কক্ষে। পাশের কক্ষে কামরুজ্জামান, হাশিম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ী, মহিউদ্দিন, আসাদুজ্জামন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। তাদের পাশের রুমে নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আব্দুল কুদ্দুছ মাখন, আশাবুল হক এমপি, আনোয়ার জং, অ্যাডভোকেট দেলওয়ার , কোরবান আলী ও শেখ আব্দুল আজীজ। সবার সাথেই ওঠাবসা আছে প্যাটেলের। তাজউদ্দীন তাকিয়ে আছেন প্যাটেলের দিকে। কথা বলতে পারছেন না। পাথরের মতো মুখ তার। সেই মুখে বেদনার ছাপ। কিছুটা অবাক হলেন প্যাটেল। বঙ্গবন্ধুকে ভুলতে পারেননি তারা। পারবেন না ভুলতে। সেই কষ্ট জমে আছে তাজউদ্দীনের মুখে। কিছুক্ষণ পরে প্যাটেল বললেন, মনসুর আলী সাহেব তো ঘুমাতে পারছেন না।

তাজউদ্দীন তাকিয়ে আছেন। কেন ঘুমাতে পারছেন না জানেন। ঘুম নাই তার চোখেও। কেমনে ঘুমাবেন। বঙ্গবন্ধু নেই। পারছেন না সেই কষ্ট দূর করতে। শূন্য বুকে রাত নামলেই হাহাকার করে ওঠে। প্যাটেল বললেন, মধ্যরাতে হঠাৎ বিলাপ করে ওঠেন মনসুর আলী সাহেব। বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেললি তোরা। রাসেলকেও মেরে ফেললি। এরপর কাঁদেন। প্রায় রাতেই এভাবে কাঁদেন। ঘুমাতে পারেন না। যখন একা থাকেন গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন।

মাথা নাড়লেন তাজউদ্দীন। ছলছল করে উঠল তার চোখ। প্যাটেলকে নিয়ে গেলেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে। বসলেন তার চৌকিতে। মাথা নিচু হয়ে গেল মনসুর আলীর। বেদনায় ভার হয়ে গেল বুক। চোখে জল। তাকাতে পারছেন না তাজউদ্দীনের দিকে। তাজউদ্দীন হাত রাখলেন তার পিঠে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্যাটেল। বললেন, চিন্তা করবেন না। মুজিব ভাইকে তো পাব না। এই হত্যার বিচার হবে। ডিসেম্বরেই বেরিয়ে যাব আমরা। চিন্তা কইরেন না।

ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনসুর আলী বললেন, মুক্তি হবে না আমাদের। এর মধ্যেও ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের বের হতে দেবে না ওরা। মেরে ফেলবে।

অবাক হলেন প্যাটেল। কয়েক দিন আগেও মনসুর আলী সাহেব বললেন, তোকে খুব আদর করতেন বঙ্গবন্ধু। আমি জানি। জেল থেকে বের হলে আমার কাছ থেকেও এমন আদর পাবি। সেই লোক আজ বলছেন তাদের মুক্তি হবে না। নিচুস্বরে তাজউদ্দীনের দিকে তাকিয়ে মনুসর আলী বললেন, জেলার আমিনুর রহমানের সাথে নিয়মিত বৈঠক করছে খুনী ডালিম, নূর, হুদা ও মাজেদ। এটা ভালো সঙ্কেত নয়। ওরা কোনো চক্রান্ত করছে। মোশতাক চাইবে না আমরা বের হই।

প্যাটেল বললেন, আপনিই তো আমিনুর রহমানকে চাকরি দিয়েছিলেন। আপনাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে!

চাকরি আমি দিয়েছি। এখন মনিবদের খুশি করার জন্য এমন কাজ করবে যা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

তাজউদ্দীন সাহেব কিছু না বলে উঠে এলেন। কেনই যেন তার মন অন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। কক্ষে ফিরে নজরুল ইসলামের পাশে বসলেন। জানালেন মনসুর আলী সাহেবের শঙ্কার কথা।

নজরুল ইসলাম কথা কম বলেন। বেশি সময় থাকেন চুপচাপ। তাজউদ্দীনের কথা শুনে মুখ তুললেন। গম্ভীর মুখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এরপর বললেন, বেঁচে থাকা নিয়ে তারও শঙ্কা রয়েছে। বাঁচার ইচ্ছে স্বপ্ন সব হারিয়ে ফেলেছেন সেই সকালে। মৃত্যু নিয়ে ভাবনা নেই। জীবন নিয়েও নেই স্বপ্ন।

বন্দীদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। সেদিন মাঝরাতে তাজউদ্দীন বসলেন সবাইকে নিয়ে। এক নম্বর কক্ষের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে। মোশতাকের তাবেদার সরকার হটিয়ে বঙ্গবন্ধু ও একাত্তরের মূল ধারার সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করার সলাপরামর্শ করছিলেন।

এখান থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হবে। হঠাৎ বলে উঠলেন মনসুর আলী সাহেব। কামারুজ্জামান সেই দুপুরের পরে চুপ হয়ে গেছেন। কথা বলছেন না। একটা মিথ্যা মামলায় আসামী করে আদালতে নিয়েছিল তাকে। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে। এটা মেনে নিতে পারেননি। কোর্ট থেকে ফিরে ৩ নম্বর কক্ষের সামনে একটা চেয়ারে বসলেন। সেই কষ্ট আর কান্নার তীব্র স্রোত আটকে রাখতে পারলেন না। বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। ছুটে এলেন আবুদস সামাদ আজাদ। আমির হোসেন আমু। শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কাজ হলো না। থামছে না কান্না। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্যাটেল। তিনি গেলেন চা বানাতে। খুব ভালো চা বানাতে পারেন। তার হাতের চা পছন্দ করেন কামরুজ্জামান। সবটাই তাকে শান্ত করার জন্য। ওই কষ্ট ভুলিয়ে অন্য কথা মনে করে দেওয়ার চেষ্টা। রুম থেকে তার স্পেশাল কাপটা আনলেন। যেটা বাসা থেকে আনিয়েছেন কামরুজ্জামান। তার কাজের ছেলে প্রতিদিন এই কাপ নিয়ে আসে। কাপ ভরে চা পাঠান প্যাটেল। চুমুক দিয়ে কামরুজ্জামান বলেন, তোমার চা টা যা হয় না। ফার্স্ট ক্লাস চা বানাতে পারো।

তাড়াহুড়ো করে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এলেন প্যাটেল। কামরুজ্জামানের হাতে দিলেন। তখনও স্থির হতে পারেননি তিনি। অনেকটা এলোমেলো। হাত কাঁপছিল। কাপটা হাতে নিলেন। কাঁপতে কাঁপতে চা অর্ধেকটা পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললেন। প্রথম যে কথাটা বললেন, ওরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে না। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। সেই থেকে চুপ। সভায় আছেন। তবে কিছু বলছেন না। আব্দুস সামাদ আজাদ কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিলেন তাজউদ্দীন। দেখলেন মেজর ডালিম জেলারসহ কয়েকজনকে নিয়ে কারাগারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই দৃশ্য খারাপ কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে গেল। সবাই নিস্তব্দ হয়ে গেলেন। মুখে নামল দুশ্চিন্তা। প্যাটেল হঠাৎ বলেই ফেললেন, এরা মনে হচ্ছে রেকি করছে। না হয় এই রাতে কেন এখানে আসবে। কোথায় জেলের নিরাপত্তা। পরিস্থিতি ভালো মনে হচ্ছে না। ইট লাঠিসোটা এনে রাখতে হবে। প্রতিহত করতে হবে ওই খুনিদের।

কেউ কিছু বললেন না। সভা ওখানেই শেষ করলেন সেদিন। এতদিন যে ভয় কল্পনায় ছিল আজ তা বাস্তব মনে হচ্ছে। দৃশ্য মৃত্যু ভয় নিয়ে ঘুমাতে গেলেন তারা। মনসুর আলীর চোখে ঘুম নেই। চোখ বন্ধ করলেই দেখেন বঙ্গবন্ধুকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন।

তাজউদ্দীন ঘুম হারালেন স্বপ্নের কাছে। সেই স্বপ্ন তাকে অস্থির করে তুলল। ঘুমাতে পারলেন না। উঠে নামাজের পাটিতে বসলেন। কিছুক্ষণ তসবিহ

পাঠ করলেন। নামাজ পড়লেন। ফজর শেষে কোরআন তেলওয়াত করলেন। একটু বেলা বাড়তেই বের হলেন হাঁটতে। মনে তার স্থির হয়ে আছে সেই স্বপ্ন। হঠাৎ সামনে পড়লেন প্যাটেল। সালাম দিলেন। উত্তর দিয়ে দাঁড়ালেন তাজউদ্দিন। তার গলা শুনে আরও কয়েকজন দাঁড়ালেন। এলেন আমু। আব্দুস সামাদ আজাদ। মায়াও দাঁড়ালেন। তাজউদ্দীন কিছুটা নির্জিব। একটা হাত তার পেটের ওপর, আর একটা হাত মুখের কাছে নিয়ে বললেন, আজকাল খুব স্বপ্ন দেখছি। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন কোনো কালেই আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতো দিন স্বপ্ন দেখতাম বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকছেন। আজ দেখলাম ৩২ নম্বরে ঢুকছি। বঙ্গবন্ধু এসে আমার হাত ধরলেন। টেনে গাড়িতে তুলে নিলেন। বললেন, চল, টুঙ্গিপাড়া যাই। একা ভালো লাগে না আমার।

স্তব্দ হয়ে গেলেন সবাই। কারো মুখে কথা নেই। তাজউদ্দীনও নিশ্চুপ। এরপর বললেন, কোনো স্বপ্ন বিশ্বাস না করলেও এই স্বপ্নটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে। চলে যাব মুজিব ভাইর কাছে। কত দিন দেখি নাই তাকে। খুব মনে পড়ছে।

৩

অস্থিরতার নগরি ঢাকা। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে জন্ম হচ্ছে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থান। রাত দেড়টা। বেজে উঠল জেলার আমিনুর রহমানের ফোন। ফোন করেছেন আইজি প্রিজন। দ্রুত কারাগারে আসতে বললেন।

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লেন জেলার। এলেন কারাগারের সামনে। দেখলেন একটা পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ভেতর কয়েকজন সৈনিক। তাকে দেখে নেমে এলো তারা। কারাফটকের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাগজ দিল। সেখানে কি লেখা দেখার সুযোগ হলো না জেলারের। মূল ফটক দিয়ে ঢুকে বাম দিকে তার রুম। সেখানে ডেকে উঠছে টেলিফোন। অস্থির হয়ে কক্ষের দিকে ছুটলেন। ফোন তুললেন। অপর প্রান্ত থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠ বলল, প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন আইজি সাহেবের সাথে। ফোন রেখে জেলার খবর দিলেন আইজি সাহেবকে। জানালেন প্রেসিডেন্ট কথা বললেন।

বাসা থেকে আইজি ফোন করলেন বঙ্গভবনে। কথা বললেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। অল্পক্ষণ কথা হলো। প্রেসিডেন্টের ফোন রেখে জেলারকে ফোন করলেন। জানালেন, আর্মি অফিসাররা যা করতে চাচ্ছেন তা করতে দিতে বললেন প্রেসিডেন্ট। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আসছি।

এরপর আইজি ফোন করলেন ডিআইজি প্রিজন আব্দুল আউয়ালকে। রাত তিনটা। এই সময় ফোন। বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ডিআইজি। দেশ অস্থির।

নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে। ফোন তুললেন। আইজি জানালেন এখনই জেলগেটে যেতে হবে।

আইজি ফোন রাখার পরপরই আবার বেজে উঠল ফোন। এবার ফোন এসেছে বঙ্গভবন থেকে। কণ্ঠটা মেজর রশিদের। জানতে চাইল, ঢাকা সেন্ট্রারাল জেলে কোনো সমস্যা আছে কিনা?

ডিআইজি আউয়াল বুঝতে পারলেন সমস্যা আছে। আইজি সাহেব এই রাতে কারাগারে যাচ্ছেন। তাকেও যেতে বলছেন। সমস্যা না থাকলে যেতেন না। কৌশলে এড়িয়ে গেলেন সেসব। বললেন, এই মুহূর্তের খবর জানা নেই আমার।

আচ্ছা। তবু একটা কথা বলে রাখি। কয়েকজন সেনা সদস্য জেলগেটে যাবে। তারা কয়েকজন বন্দিকে তুলে আনবে। না হয় অন্য কিছু করবে। জেল গার্ডদের সতর্ক করে দিবেন। তাদের কাজে যেন বাধা না দেয়।

ফোনের লাইন কেটে গেল। হতবম্ভ হয়ে গেলেন ডিআইজি। খানিকক্ষণ লাগল সম্বিত ফিরতে। এরপর ফোন করলেন কারাগারে। জেল গেটের দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ডারকে মেসেজটি জানিয়ে দিলেন। বললেন জেলারকে পৌঁছে দিতে। যেন নিরাপত্তা জোরদার করেন।

এই ফোন রাখার মিনিট তিনেক পরে আবার বেজে উঠল ফোন। এই ফোনটাও বঙ্গভবন থেকে এসেছে। অন্য একজন আর্মি অফিসারের ফোন। জানতে চাইল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গার্ডদের সতর্ক করেছেন কিনা? তার কণ্ঠ অস্থির।

স্থির গলায় ডিআইজি জানালেন হ্যাঁ, সতর্ক করেছেন।

তাকে জেলগেটে যেতে বলে ফোন রাখলেন। ডিআইজি আবার ফোন ঘুরালেন। এবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ডিআইজি প্রিজনকে ধরলেন। এই খবর জানিয়ে ফোন রাখলেন। এরপর দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।

ঢাকার পথে সেনাবাহিনীর ট্যাংক। অভ্যুত্থানের জন্য মহড়া দিচ্ছে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন খালেদ মোশাররফ। সেই ভীতিকর অবস্থা পেরিয়ে জেলগেটে এলেন আউয়াল। রাত তিনটা বিশ। জেলগেটে দাঁড়িয়ে আছেন আইজি প্রিজন। তাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। বঙ্গভবন থেকে কয়েকবার ফোন এসেছিল। তা জানালেন। বসলেন তার অফিস কক্ষে। খানিক পরেই আর একটা ফোন রিসিভ করলেন আইজিপি। কার সাথে কথা বলছেন জানেন না। তাকে জানানো হলো ক্যাপ্টেন মোসলেম কারাগারে যাবে। তাকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। যা করতে চান তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। বন্দি তাজউদ্দীন, মনসুর আলী, নজরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামানকে চিনিয়ে দিবেন।

আইজি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চাইলেন। তার আগেই কেটে গেল ফোনের লাইন। ফোন রেখে স্টাফদের সতর্ক করলেন। নির্দেশ দিলেন অতন্দ্র থাকার। সবাই চিন্তিত। কিছু বুঝতে পারছেন না। কী হতে যাচ্ছে। কী করতে চাচ্ছে তারা। কেন এই রাতে আর্মির বিতর্কিত অফিসাররা কারাগারে আসবে। কেনই বা তাদের চিনিয়ে দিতে বললেন। এরই মধ্যে স্টেনগান ও এসএলআর সুসজ্জিত চারজন সশস্ত্র কর্মকর্তাসহ অফিস কক্ষে ঢুকল ক্যাপ্টেন মোসলেম। ইন্সপেক্টর জেনারেলকে জিজ্ঞেস করল, তিনি নূরুজ্জমান কিনা?

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন মোসলেম। বলল, দ্রুত করুন।

কী করতে হবে?

আপনার কাছে কোনো ফোন আসেনি? কোনো নির্দেশ দেয়নি?

হুম, ফোন এসেছিল। চারজনকে চিনিয়ে দিতে বলেছে।

হ্যাঁ, তাদেরকে চিনিয়ে দিন। গুলি করব। কারাগারের ভেতর।

থতমত খেয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। কী বলছে গুলি করবে। অন্যদের মুখও শুকিয়ে গেছে। এরপর মুখ তুললেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বললেন, এ জাতীয় কোনো নির্দেশ তিনি পাননি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

আচ্ছা বলেন। তাড়াতাড়ি করেন। সময় নেই। অস্থির কণ্ঠ তার।

ফোন ঘুরালেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বেশ কয়েকবার। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেন না। এখন কী করবেন। ভাবতে পারছেন না। এই সময় একজন জানাল জেলারের অফিসে বঙ্গভবন থেকে ফোন এসেছে। সে ফোন ইন্সপেক্টর জেনারেলের।

ফোন ধরার জন্য উঠে গেলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। তাকে অনুসরণ করলেন আউয়াল। তাদের পেছনে সামরিক কর্মকর্তরা। কথা বলল কর্নেল ফারুক। প্রেসিডেন্ট বসে আছেন। তাকে ঘুমাতে দেননি। ঘিরে রেখেছে। কর্নেল নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন মোসলেম যা করতে চাচ্ছে তা করতে দিন।

ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চাইলেন। কথা বলতে পারলেন না। রুক্ষ কণ্ঠে কর্নেল বলল, নির্দেশ পালন করেন।

ইন্সপেক্টর জেনারেল কিছুটা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ক্যাপ্টেন মোসলেম তাদের গুলি করতে চাচ্ছেন।

গুলি করতে চাইলে করতে দিন। সময় নষ্ট করছেন কেন। বিলেনের কণ্ঠে বলল কর্নেল।

ফোন রেখে ঝিম দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। মোসলেম বন্দুকের নল ঠেকাল আউয়ালের বুকে। এরপর নির্দেশ দিলেন জেলের ভেতরে নিয়ে যেতে। তাদের দেখিয়ে দিতে কোথায় আছেন তাজউদ্দীনসহ অন্যরা।

সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। ডিআইজি, জেলার ও অন্য নির্বাহী স্টাফরাও হাঁটছেন তাদের পেছনে। কিছুক্ষণ হেঁটে ডিআইজি থামলেন। বললেন, প্রেসিডেন্টর হুকুম ছাড়া এসব করা অসম্ভব। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

পেছন দিকে তাকাল মোসলেম। হুমকির সুরে বলল, আপনি ভয় পাচ্ছেন?

প্রশ্নটা ভয়ের না। দীর্ঘ চাকরি জীবনে এরকম ঘটনার মুখে পড়িনি। এই প্রথম। আমাদের স্লোগান রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ। সেখানে দরজা খুলে দিয়ে কাউকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারি না।

ক্ষ্যাপা ষাড়ের মতো গোত করে উঠল মোসলেম। অন্য একজন সামরিক কর্মকর্তা এসে তার পাশে দাঁড়াল। হাত রাখল কাঁধে। বলল, আপনি চলে যান।

ইন্সপেক্টর জেনারেল বাধা দিলেন। উনি যাবেন না। এখানে থাকবেন। আমাদের সাথে যাবেন।

আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া চোখে তার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। কয়েকজন নির্বাহী স্টাফকে বলল, তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে এক রুমে জড়ো করতে। যত দ্রুত সম্ভব।

তারা চলে গেল কারাগারের ভেতরে।

৪

লোহার গেটে হঠাৎ ঝন ঝন শব্দ। কানখাড়া করলেন প্যাটেল। তার মনে ভয় জাগাল এই শব্দ। বিছানা ছেড়ে সামনে এলেন। বুঝতে পারছেন না কোন গেটে শব্দ। সামনে এসে সিপাহিকে জিজ্ঞেস করলেন, এত রাতে গেট খুলছে কারণটা কী? কোন গেট খুলল?

নিচুস্বরে সিপাহি বলল, ভেতরে যান। খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে।

সিপাহির কথা বুঝতে পারলেন না প্যাটেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সিপাহি গেটের আরও কাছে এলেন। বললেন, দুই নম্বর কক্ষের গেট খোলা হয়েছে। কামরুজ্জামান সাহেবকে বের করে নিয়ে গেছে।

কারা নিয়েছে?

জানি না।

প্যাটেল বুঝতে পারলেন অবস্থা ভালো না। তারা যে ভয় করছিলেন তেমন কিছু হতে যাচ্ছে নাকি। না, তেমন কিছু যেন না হয়। এরই মধ্যে দুই নম্বর কক্ষে থাকা অন্য বন্দীরা চলে এলেন তিন নম্বর কক্ষে। তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।

কামরুজ্জামানকে নিয়ে গেল এক নম্বর কক্ষে। সেখানে আছেন তাজউদ্দীন ও নজরুল ইসলাম। তাজউদ্দীন কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। ঘুমাতে পারছেন না। কামরুজ্জামানকে দেখে কোরআন শরীফ রাখলেন। কিছুটা অবাক হলেন। এই সময় কক্ষ পরিবর্তন। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না তার। কিছু বললেন না। দেখলেন তাদের তিনজনকে রেখে অন্য বন্দীদের বের করে নিচ্ছে। এবার বুঝতে পারলেন অন্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কামরুজ্জামান ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন ওরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে না। আজই মেরে ফেলবে। এটাই হবে আমাদের শেষ রাত।

কামরুজ্জামানকে রেখে তারা এলো তিন নম্বর কক্ষে। মনসুর আলীকে নিতে। তিনি বসে ছিলেন মশারীর ভেতর। হাবিলদার নায়েব আলী বলল, আপনার এক নম্বর কক্ষে যেতে হবে।

কিছু বললেন না মনসুর আলী। চট করে বিছানা থেকে নেমে অজু করতে গেলেন।

ক্যাপ্টেন মোসলেম অস্থির। সিগারেট জ্বালাল। বারবার ঘড়ি দেখছে। এত দেরি করছে কেন। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, শেখ মুজিবকে খতম করতে তিন মিনিট লাগছিল। এখানে এত দেরি হচ্ছে কেন।

আউয়ালকে ভেতরে যেতে বললেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বিষয়টা দেখতে ভেতরে ঢুকলেন আউয়াল। তিনজনকে এক নম্বর কক্ষে আনা হয়েছে। বাকি রয়েছেন মনসুর আলী সাহেব। তিন নম্বর কক্ষের সামনে গেলেন তিনি। দেখলেন মনসুর আলী সাহেব অজু করে দাঁড়িয়েছেন। পাঞ্জাবি গায়ে দিচ্ছেন। হাতে তসবিহ। আউয়াল সামনে গিয়ে সালাম দিলেন। বললেন, স্যার সেনাবাহিনীর লোকেরা এসেছে। আপনাকে এক নম্বর কক্ষে যেতে হবে।

হাবিলদার নায়েব আলী ঝাপটে ধরল তার কোমড়। এরপর টানতে শুরু করল। কক্ষের অন্যরাও জড়ো হলো। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এভাবে কেন নিচ্ছে। মনসুর আলী কিছু বলছেন না। নিস্তব্দ হয়ে গেছেন। প্যাটেল সামনে এলেন। কিছুটা সাহস জোগালেন। বললেন, ওরা হয়তো জোর করে কোথাও আপনার স্বাক্ষর নিবে।

কোনো রাগ করলেন না মনসুর আলী। পাথর চোখে তাকালেন প্যাটেলের দিকে। সে ভাষা ছিল জীবন দেব তবু স্বাক্ষর করব না।

মনসুর আলীকে নিয়ে এলো এক নম্বর কক্ষে। ক্যাপ্টেন মোসলেম তার দল নিয়ে রুমের সামনে এলো। ভেতরে পা রেখেই শুরু করল গুলি। প্রথম গুলিটা লাগল মনুসর আলীর বুকে। এক মিনিটও হয়নি। এই শব্দ এলো তিন নম্বর কক্ষে। বিচলিত হয়ে পড়লেন তারা। তাজউদ্দীনের কণ্ঠ শুনলেন। তিনি বলছেন, আহা কী কর? কী কর?

ওটাই শেষ শব্দ। এরপর শুধু গুলির শব্দ শোনা গেল। ঠা ঠা। কোনো আর্তনাদ নেই। নেই বাঁচার আকুতি। পাশের কক্ষে যারা রয়েছেন তারা ভাবছেন চার নেতা শেষ। তাদের মেরে ফেলেছে। আবার ভাবলেন নাও মারতে পারে। নেতাদের অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়তো আতংক সৃষ্টি করছে। কিছুক্ষণ পরে সব থেমে গেল। কোনো শব্দ নেই। লোহার গেট বন্ধ করার শব্দ এলো দুই মিনিট পরে। মিনিট তিনেক পরে আরও পাঁচটা গুলির শব্দ। নামাজে দাঁড়ালেন আব্দুস সামাদ আজাদ। মোসলেম এলো তিন নম্বর কক্ষের সামনে। দেখল আজাদ নামাজে দাঁড়িয়েছেন। তাকেও গুলি করতে চেয়েছিল। এই নামটা এসেছে শেষ সময়। না করেই ফিরে গেল। কারাগারের ফটক থেকে তারা বেরিয়ে গেল। রাত চারটা পঁয়ত্রিশ। কারাগারে বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা। হুড়স্থুল শব্দ। কাসার ঘণ্টায় ঢং ঢং। বন্দীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক।

তাজউদ্দীন বেঁচে আছেন। তার পায়ে ও তলপেটে লেগেছে গুলি। পানি পানি করছেন। কেউ এগিয়ে আসছে না। গড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার চোখের সামনে কামরুজ্জামান ও নজরুল ইসলামের লাশ। মনসুর আলী দরজার সামনে। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে কোকড়াচ্ছেন।

এক নম্বর কক্ষের সামনে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না কারো। উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছেন সবাই। কী হয়েছে তখনও ঠিক বুঝতে পারছেন না। আজান পড়েছে ফজরের। ক্যাপ্টেন মোসলেম এলো বঙ্গভবনে। জানাল চারজনকে খুন করেছে। বাহবা দিল ফারুক। এই সময় ফোন বেজে উঠল। নায়েব আলী জানাল মনসুর আলী ও তাজউদ্দীন বেঁচে আছেন।

ক্রোধে ফেটে পড়ল ফারুক। নির্জিব প্রেসিডেন্ট অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকালেন। কাতর কণ্ঠে বললেন, আমি নামাজে দাঁড়াব।

ফারুক আর একটা দল পাঠাল কারাগারে। তারা মৃত্যু নিশ্চিত করে ওই জায়গা পরিদর্শন করে আসবে। তখন সকাল হয়ে গেছে। পাঁচটা পচিশ। নায়েব আলী এলো জেলগেটে। এক নম্বর কক্ষে গেল তাদের নিয়ে। এবার বেয়োনেট

দিয়ে তাজউদ্দীন ও মনসুর আলীর মৃত্যু নিশ্চিত করল। এরপর বেড়িয়ে গেল তারা। সূর্য উঠে গেছে তখন। বাইরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেনাদের ট্যাংক। প্রেসিডেন্টকে ঘিরে বসে আছে ফারুক, রশিদরা। আওয়ামী লীগককে নেতৃত্ব শূন্য করতে পারলেও তাদের চিন্তা দূর হচ্ছে না। আর একটা অভ্যুত্থান ধেয়ে আসছে।

সকাল হতেই পরিষ্কার হয়ে গেল এক নম্বর কক্ষে খারাপ কিছু ঘটেছে। তবু কেউ সাহস পাচ্ছে না কক্ষ থেকে বের হতে। স্থবির হয়ে গেছে কারাগার। প্যাটেল সাহস করলেন। বের হবেন তিনি। দেখবেন চার নেতা কেমন আছেন। হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দায় যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ওই রুমে কোনো শব্দ নেই। না আর্তনাদের, না শ্বাসের। তাদের অন্যত্র নিয়ে গেল কিনা। হঠাৎ চোখ আটকাল তার জেলের ড্রেনে। আতকে উঠলেন। দেখলেন রক্ত। ভেসে যাচ্ছে তাজা রক্ত। চীৎকার করে উঠলেন। সামাদ ভাই , সামাদ ভাই, চার নেতা নাই। কক্ষের ভেতর থেকে উচ্চস্বরে ভেসে এলো কান্নার শব্দ। পাগলা ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ ভেসে আসছে তীব্র জোরে। সে শব্দ গিলে খাচ্ছে কান্নার শব্দ। তবু সে কান্না ভারি করে তুলেছে কারাগারের আকাশ। গরাদের দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে কষ্টের দীর্ঘশ্বাস।♦

২০২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন কবি

লুইস গ্লাক-এর দু'টি কবিতা

আবু মুসা চৌধুরী

লুইস গ্লাক ১৯৪৩ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। লং আইল্যাণ্ডে তার বয়োবৃদ্ধি। তিনি লেখাপড়া করেন সারাহ লরেন্স কলেজ ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকার সাম্প্রতিক গুণবিচারী ও মনস্বী কবিদের অন্যতম তিনি।

প্রায়োগিক নৈপুণ্য, সংবেদনা এবং নৈঃসঙ্গ পারিবারিক সম্পর্ক, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুর অন্তর্দৃষ্টি গ্লাকের কবিতার প্রতিপাদ্য। তার কবিতা সম্পর্কে কবি রবার্ট হাস বলেন, "সবচেয়ে খাঁটি এবং চূড়ান্ত গুণান্বিত লিরিক কবিদের একজন এখন লিখছেন।" তিনি এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। "তার কবিতা অভ্রান্ত কাব্যিক কণ্ঠ, যা সাদামাটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ব্যক্তিক অস্তিত্বের সর্বজনীনতায়।"

লুইস গ্লাক-এর সাম্প্রতিক কাব্য-'ফেইথফুল অ্যান্ড ভেরিয়াস নাইট লাভ করে ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড। 'পয়েমস' পায় লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস বুক প্রাইজ। লুইস গ্লাক-এর অন্যান্য কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে- দ্য হাউস অব মার্শল্যান্ড, দ্য গার্ডেন, ডিসেন্টিং ফিগার, আ ভিলেজ লাইফ ইত্যাদি।

গ্লাক এখন ইয়েল ইউনিভার্সিটির 'রাইটার ইন রেসিড্যান্স' এবং বসবাস করেন ম্যাসাচুসেট্স-এ।

নির্জনতা

আজ খুব অন্ধকার; বৃষ্টির কারণে।
পাহাড় দৃশ্যমান নয়। কেবল বৃষ্টির
শব্দ। জীবন নিয়ে গেলো অন্তরালে।
এবং বৃষ্টির পাশাপাশি ঠাণ্ডা নেমে আসে।
আজ রাতে চাঁদ নেই, তারকা নেই।

বাতাস বয়েছিলো রাতে;
সমস্ত সকালে গম-এর প্রতিপক্ষ এই কশাঘাত-
থেমে গেলো বিকেলে। কিন্তু ঝড় বয়ে যায়,
ডুবিয়ে দিলো শুষ্ক প্রান্তর, অতঃপর বন্যা-

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী।
কিছুই দেখার নেই, এই বৃষ্টি
অন্ধকার জানালাগুলোর বিপরীতে ঈষৎ অস্পষ্ট কেবল।
এ হলো বিশ্রামের স্থান, যেখানে কোনোকিছুই সচল নয়-

যেখানে আমরা ছিলাম- সেখান থেকে ফিরে আসি,
অন্ধকারে পশুদের বসবাস
ভাষা বা দৃষ্টিবিহীন

আমি যে জীবিত তার কোনো প্রমাণ নেই।
এখানে কেবল বৃষ্টি। বৃষ্টি অশেষ।

প্রথম তুষার

পৃথিবী ঘুমোতে যায় এক শিশুর মতো
অথবা এমন গল্প বয়ে যায়।

কিন্তু আমি ক্লান্ত নই, ইহা বলে।
এবং মা বলে, তুমি হয়তো ক্লান্ত নও, কিন্তু আমি ক্লান্ত-

আমি তা দেখতে পারো তার মুখাবয়বে, প্রত্যেকে পারে।
অতঃপর তুষারপাত হোক, ঘুম এসে যাক
যেহেতু মায়ের পীড়ায় মৃত্যুর দিকে তার জীবন
এবং চায় নীরবতা।♦

ইরাকি-স্পেনিশ কবি ও অনুবাদক

আব্দুল হাদি সাদৌনের কবিতা

গাজী সাইফুল ইসলাম

আব্দুল হাদী সাদৌনের (Abdul Hadi Sadoun) জন্ম ১৯৬৮ সালে ইরাকের বাগদাদে। বর্তমান নিবাস স্পেনে। ১৯৯৩ থেকে প্রবাসে থিতু হয়েছেন। ১৯৯৭ থেকে সম্পাদনা করেন আরবি ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক জার্নাল আালবাহ্ (Alwah)। এ জার্নালের বিশেষত হলো, এতে প্রবাসী আরব কবি লেখকদের লেখাই প্রাধান্য দিয়ে ছাপা হয়। তিনি ওখানকার বেশ ক'টি অ্যাকাডেমিক সেন্টারে আরবি সাহিত্যের ওপর অধ্যাপনা করেন। বক্তৃতা করেন হিস্পানিক সাহিত্যে আরব সংস্কৃতির প্রভাব ও উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ স্পেনিশ সাহিত্যকর্ম আরবি ভাষায় এবং আরবি সাহিত্যকর্ম স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। যেমন অ্যান্তোনিও মাচাদো, ভিসেন্ট আলেক্সান্দ্রে,

গর্সিয়া লোরকা, জোয়ান র‍্যামন জিমনেজ, হোর্হে বোর্হেস, আলবার্তি প্রমুখ। লাতিন আমেরিকার ছোটগল্প ও আধুনিক স্পেনিশ কবিতা। তার নিজের কিছু গল্প-কবিতাও ইংরেজি স্পেনিশ, জার্মান, ফ্রেন্স, ইতালিয়ান, ফার্সি, কুর্দিস কাতালান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ কবির সঙ্গে ফেসবুকে বন্ধুত্বের সুবাদে তার কবিতাগুলো আমি পেয়েছি।

তার প্রকাশিত বইসমূহ হলো: আরব ও স্পেনিশ ভাষার বই*: দ্য ডে ওয়ারস অ্যা স্যুট স্ট্যাইন্ড রেডশী-১৯৯৬, ফার্মিং অব লাফটার-১৯৯৮, শীত ছাড়া কিছু না-২০০০, মৃত মাছেরা- ২০০২* ইত্যাদি।

নিস্তেজ মাছেরা

ঝর্ণাটিতে নিস্তেজ মাছেরা জড়ো হয়
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পরস্পর থেকে উষ্ণতা পাবার আশায়।
তারা সম্ভবত বিস্মিত ও হতবাক হয়
যখন আমি হেঁটে যাই ঝর্ণাটির পাশ দিয়ে
নতুন স্যুটকোট আর কাপড়ের তৈরি আমার ত্বক দেখে
তারা কী ভাবে কে জানে?
বাতাস পাখির ডানা ঝাঁপটানোয়
কুঞ্চিত কাতর হয় আমার পোশাক।

প্রতিদিন বাসে আমি তাদের
দেখতে দেখতে যাই
একটি লোক সর্বদা ঝর্ণাটির দিকে ঝুঁকে থাকে
তার কাজ পাথরগুলো পলিশ করা

আমার ভাবনা হয়, নিস্তেজ মাছেরা
কী ভাবে, নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে?
তারা তো সাঁতারই কাটতে জানে না।

এ মুহূর্তটি

এ মুহূর্তটি
এবং তার ছায়া
নিয়েছে আমার প্রতিরূপ ।

এটি লালরঙের
আমি ডুবেছি এর লালীমায়

এ মুহূর্তে;

রূপকালঙ্কারে আঘাত করছে
এর বিস্মৃতি
দেয়ালগুলোর বিপরীতে,
অতৃপ্তিই
পছন্দ তাদের
যেমন পছন্দ তলদেশ, অশেষ।

এই মুহূর্তটি ক্ষণমধ্যেই
হারিয়ে গেল–অতল গহ্বরে
যেতে যেতে বিরবির করল
কুকুরের পরিচারকদের দম্ভ
ক্ষণস্থায়ী খুব,
চীৎকার, চ্যাঁচামেচি, অবশেষে
ভাঙাচূরা একটি ডিস্কের মত
দূষণ ছড়ায় শব্দে।

শুনতে পাই
মুহূর্তটির বিদায়ী পদশব্দ
এটি আসে, যায়
আর আমি থাকি
অপেক্ষায়।

মেঘেদের ভিড়ে

মেঘেদের ভিড়ে
যখন আমায় আবিষ্কার করলে তুমি
আমার দেখভালে ছিল
আমারই নিরবতা
আর মৃত্যু নির্জনতা;

আমার আত্মার প্রদর্শনীতে
ওরা ডাকছিল আমায়
নাম না ধরে
কারণ, আমি যে পারি না
সাড়া দিতে

পদক্ষেপ

বিবর্ণ আয়নায়
আমার পদক্ষেপগুলো তরল হয়
এরপর গড়িয়ে যায় অতল গহ্বর সন্ধানে
যা রয়েছে নির্দোষ-নিখাদ
এখনো..

শূন্যগর্ভ

তোমার কল্পনা
শীর্ষ থেকে হুড়মুড়িয়ে
ভেঙে পড়ছে
আমার দেয়ালের ওপর
অন্যেরা যখন
অবিরাম ঘুরছে
ফাঁকা একটি বৃত্তের চারপাশে।

বিবর্ণ আয়নায়

বিবর্ণ আয়নায়
প্রতিটি পদক্ষেপ দিই
তরলের সঙ্গে মিলেমিশে
একাকার হয়ে
অনুসন্ধান করতে বের হই
অতল গহ্বরের
এখানো চাই
দোষণমুক্ত হোক
জীবন।

তাইগ্রিসের কাছে

আমার আগমনকালে
এখানে, যেখানে আমি তাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম
তাইগ্রিসের কাছে,
আমার মা জিজ্ঞেস করলেন:
–পুত্র, এত দূরে গিয়ে, কী কর তুমি?

তুমি যা বল, লোকেরা কি তা বুঝে?
তোমার ভাষা কি তারা জানে?
আমাদের মুখ,
আমাদের বেদনা?
তারা কি জানে, তুমি কে?
আমরা কি কেউ হই তাদের?
দূরবর্তীতাজনিত
কত না পার্থক্য
ভিন্ন তীরবর্তী ভূমির।
–আমার সম্পর্কে তাদের বলো
এই ঘরের বারান্দা
বাড়ির উঠোন,
তোমার ফেরার পথ চেয়ে
চিরদিন যারা অপেক্ষা করবে।
শেহরাজাদের বিস্ময়কর গল্পটিও
তাদের বলো। সেও তো ছিল
বাগদাদেরই মেয়ে।
–বাগদাদের দুর্বৃত্ত আর চোরদের গল্প
তাদের ধ্বংস
এবং পুনর্জন্ম সম্পর্কে
অথবা একেবারে চুপ থেকো
কথা ভুলে যাওয়ার মত
যদি পুনর্জন্মে কিংবা অনস্তিত্বে
বিশ্বাস না থাকে?

–সেই কাফেলার কথা বলো
মৃতদেহ বহনকারীদের কাফেলা।
পুত্র, তুমি কি তোমার মাথা
লুকিয়ে ফেল ভূমিতে
অস্ট্রিচ পাখির মত
এত অশ্রু লুকাতে না পেরে?
–সেই কাফেলার কথা বলো
সাদ্দাম যাদের কবর দিয়েছিল

বালিতে
যেখানে মরেছে তোমার ভাই
ওখানেই সমাধিস্থ সে
চিরদিনের জন্য,
শুকনো পাতার বিছানায়।

তোমার পিতা সম্পর্কে বলো
তোমার চাচা,
আর আমাদের গরীব প্রতিবেশী সম্পর্কে
তার পুত্র সম্পর্কেও
বুশের ট্যাঁঙ্ক বহর
কীভাবে বাগদাদকে মাটির সঙ্গে মিশিয়েছে,
যদিও সবকিছুসহ
শহরবাসী শান্তিই প্রত্যাশা করেছিল।

–মা, আমার মাথা লুকোনোই আছে
কারণ তাদের আঙুল তোলা
আমার দিকে।
আমাকে উড়ার অনুমতি দিন
যুদ্ধ সম্পর্কে চাই না জানতে
কোনো আগ্রহও নেই
যেখানে নিজেদেরই গিলে খাচ্ছে তারা
অন্তহীন অতীত থেকে।
–না,
আমাদের যাত্রা সম্পর্কে
আপনাকেও বলব না, মা।
আমি শুধু সামনের দিকে তাকাব
গ্রীষ্মকাল
এবং এই পথ
দেখতে পাবে বেদনাবিদ্ধ হৃদয় আমার। ♦

শ্র | দ্ধা | ঞ্জ | লি

১২ নভেম্বর কবি বেলাল চৌধুরীর জন্মদিন

স্মৃতিতে ও কবিতায় বেলাল চৌধুরী

জব্বার আল নাঈম

মনের গভীরে পুষ্পের মতো ঘুমিয়ে থাকা বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে পারেন কেবল একজন কবি। পারেন ব্যক্তিগত কষ্টকে জাতীয় কষ্টে রূপান্তর করতে। আবার কষ্ট ও বিদ্রোহকে একত্রিত করে বানাতে পারেন প্রেমের মালা। সেই মালা গলায় দিয়ে কবির অসাধারণ কল্পনার বিস্তার সম্ভব। সৃষ্টিশক্তি ও বাস্তবের সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়ার দুঃসাহস কেবল একজন সত্যিকারের কবি-ই

দেখাতে পারেন। এমন দিব্যশক্তির ভয়ে আতংকিত থাকে স্বয়ং রাষ্ট্র। পরিকল্পনার ছক আঁকে রাষ্ট্রের পরিচালক। যখন পরামর্শক হয় একজন দার্শনিক অথবা বুদ্ধিজীবী। প্লেটো রিপাবলিক থেকে কবিদের বের করার মতো সাহস দেখাতে চেয়েছিলেন। আর এমন শঙ্কাকে আমরা অমূলকও ভাবতে পারি না। কারণ কবিরা বাস্তবের দাস স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। কবি সর্বদা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণতা খোঁজেন বলেই সবসময় ভেতরে ভেতরে বিয়োগবোধ ব্যথিত হন। কবি নিজে আবেগপ্রবণ। কল্পনার ভেতরে নিজেকে সাজান। পাওয়া আর না পাওয়ার ভেতরেও নিজেকে শান্ত রাখেন মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে। কবি সেই যে ধীরে ধীরে অতি সাধারণ মানুষের মতো নিজেকে নষ্ট করে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে পারেন নিজেকে। এই নষ্টটা মূলত স্বর্ণকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মূলত খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া। কবি বাস্তবতাকে মেনে কিংবা না মেনেই নিজেকে জানান দেয়। অস্তিত্ব ঘোষণা দেয়।

অথচ কল্পনার কারণে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের অপূর্ণতা তৈরি হয়। তখন সুন্দরের বন্দনা শুনে কবির মন আরো বেশি পুলকিত বোধ করে। স্মৃতির গতরে হারিয়ে নিজেকে উদ্বেলিত করেন দ্বিগুণ। একজন কবির সংবেদনশীলতার পেছনে থাকে অনেক কারণ। সেই কারণের তালিকায় চোখ বুলালে দিব্য হয় জীবন-যাপন-যন্ত্রণা এবং সময়ের পিপাসা। পিপাসার দরজায় নারীর অঞ্জলী বিছিয়ে দিয়ে মানুষের সবগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় জীবনের চাওয়া-পাওয়া। সেই চাওয়া-পাওয়া যখন হয় কবি। কবি মানে শিল্প। শিল্পের ভেতরের ভেতরে থাকে কবি, উপন্যাসিক, গানের শিল্পী, চলচ্চিত্র ও বিনোদন।

এসবকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্লেটোর পক্ষে সত্যিকারার্থে ছিল কঠিন। এটা চতুরতা এবং সময়ের পিঠে আরোহণের কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন, I have immortal longings in me. জীবনে সুখের মতো দুঃখ থাকে বা থাকবে। সেই দুঃখগুলোকে হিরন্ময় আকারে উপস্থাপন করে মানুষের দ্বারে দ্বারে দাঁড় করাতে পারেন কেবল কবি। কবি পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সীমালঙ্গন করতে। সত্য আর মিথ্যাকে বাতাসে উড়াতে। এখানে এভাবেই প্রাসঙ্গিক আধুনিক কবি বেলাল চৌধুরী (জন্ম : ১২ নভেম্বর, ১৯৩৮, মৃত্যু : ২৪ এপ্রিল, ২০১৮)।

০২

বেলাল চৌধুরীর প্রভাব কলকাতার বিভিন্ন কবি ও কথাসাহিত্যিকদের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পার্থিব থাকাবস্থায় শক্তিও বুদ ছিল বেলাল চৌধুরীর

কবিতায় কিংবা ব্যক্তি বেলাল চৌধুরীর প্রেমে। প্রেম ও ভালোবাসায়। শক্তি পছন্দ করতেন বেলাল চৌধুরীকে। বেলাল চৌধুরী ১৯৬৩ সালের দিকে কলকাতায় ছুটে যান। উদ্দেশ্য সেখানে সাহিত্য রচনা করবেন। সেসময়ে কলকাতায় অনেক কবি ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন। যারা সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বেশ প্রভাব ফেলেছিলেন। তাদের একজন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যিনি বেলাল চৌধুরীকে নিয়ে বলেছেন, 'সে নাকি জাপানে ট্রলি-বোঝাই এ্যালিগেটর নিয়ে আসছিল, সমুদ্রে ভাসিয়ে। তারপর, ভাসমান এ্যালিগেটর জলে ভেসে গেল। একাকী বেলাল আছে সমুদ্রবেলায় পড়ে। সাধারণত, কলকাতায় বৃষ্টি শুরু হয় জুন ও জুলাই মাসে। যাহোক-তাহোক করে বেলাল উঠেছে। পুবের সূর্যের মতো। অভিসন্ধি! কোনো কিছু নেই। বেলাল বালক শুধু হলুদ নদীর তীরে...তারপর, বেলা গেছে। শাল সেগুনের ছায়া বেলালকে নিয়েছে সর্বদা।' (শক্তি চট্টোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহ; খণ্ড ৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা)

যিনি জীবনবাজী রেখে ছুটিয়েছেন কবিতা নামক এক পাগলা ঘোড়া। ঘোড়াটি ঢাকা থেকে কলকাতা। আবার কলকাতা থেকে ঢাকা। কলকাতার অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন সেসময়। কলকাতার রাতে কখনই কবি বেলাল চৌধুরীর জন্য সুখকর ছিল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহধর্মীনি স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানিতে শুনতে পাই, 'শুনেছি, কলকাতা থাকার সময় বেলাল মাঝেমধ্যে পার্ক সার্কাসের কবরখানায় রাত কাটাত। এডভেঞ্চার ভালোবাসত বেলাল। সুনীল ওকে এক বাঙালিবাবুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বহুকাল আগে। সেই বাবু যখন দেশের বাড়িতে যেতেন তখন বেলাল সেই বাড়ির ঠাকুরদের পুজো দিত।' একজন কবি শুধু যে কবিতায় বোহেমিয়ান ছিল তেমনটি নয়, বাস্তবেও বোহেমিয়ান। এটা এক বেলাল চৌধুরীর পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিল।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে ছিল হৃদয়ের বন্ধন। কবির আশি বছরের জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে কলকাতায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কবির একেবারে কাছের স্বজন। হরিহর আত্মা। এ সম্পর্কে আবারও স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'বেলাল খুব বড়ো মনের মানুষ ছিল। সেজন্যই বোধ হয় সুনীল-বেলাল অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিল। দু'জনের মধ্যেই কোনো জাতপাতের গোঁড়ামি ছিল না। একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসত। সুনীল বেলালের কথা কোনো দিন ফেলতে পারত না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও বেলাল কোনো কাজ দিলে সেটাই আগে করত। আমরা বহুবার বেলালের ডাকে বাংলাদেশে গিয়েছি। বেলাল আড্ডাবাজ হলেও অনেকের মধ্যে একা হয়ে যেতে ভালোবাসত। একবার ঢাকায়

একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছি, সবাই অপেক্ষা করে আছে ওঁর জন্য, কিন্তু শেষ অব্দি বেলাল আর অনুষ্ঠানে এলো না।'

বেলাল চৌধুরী অংশগ্রহণ করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সম্পাদনায়। যেটি এখনও শিল্প সাহিত্যের সৃজনে এক মাইলফলক বাংলা সাহিত্যে। উজ্জ্বল ঘটনা। প্রায় দেড় দশক কলকাতা কাটিয়ে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। নতুন করে শুরু করেন তাঁর যাত্রা। সমবয়সী কিংবা সিনিয়র-জুনিয়রদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিনগুলোকে সাহিত্য-চোখে পর্যবেক্ষণে তেমন সমস্যা হয়নি কবির। তিনি সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। অপরিচিত কাউকেও তিনি খুব কাছের বা আপন ভাবতেন। বুকে টেনে নিতেন। বিপদে আপদে ছুটে যেতেন। এটা ছিল বেলাল চৌধুরীর বড়ো গুণ।

বিভুরঞ্জন সরকারের আলোচনা থেকে পাই, 'তিনি এমন একজন মানুষ যে মুহূর্তেই তাকে আপন করে না নিয়ে উপায় থাকে না। ঢাকার জীবন গুছিয়ে নিতে, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিতে তার খুব সময় লাগেনি। বেলাল চৌধুরীর কবিতা বা অন্য সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করার যোগ্য বা উপযুক্ত লোক আমি নই। তার সঙ্গে নানাভাবে মেশার যে সুযোগ আমার হয়েছিল তার সূত্র ধরেই কিছু কথা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পেশ করছি।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার অনেক আড্ডায় উপস্থিত থাকার। প্রচুর সময় আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। ঘুরে বেড়িয়েছি এখানে সেখানে, শহরে এবং নিভৃত পল্লিতে। তার সবগুলো বলা যাবে না, দু-একটি শুধু উল্লেখ করব। বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সময়টা ঠিক মনে নেই। তবে সম্ভবত ১৯৭৮-৭৯ সালের দিকে হবে। তিনি তখন সচিত্র সন্ধানী নামের সেসময়ের জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের নির্বাহী অথবা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। গাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ ছিলেন সন্ধানীর সম্পাদক-প্রকাশক। পুরানা পল্টনে সন্ধানী অফিসেই বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা। আমরা কাছাকাছি বয়সের না হলেও বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠতে সমস্যা হয়নি। সেসময় গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের বাসায় ঢাকার খ্যাতিমান এবং উঠতি লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডা হতো বলতে গেলে প্রায় সন্ধ্যাতেই। গাজী ভাই ছিলেন একসময় লেখক-শিল্পীদের অঘোষিত পৃষ্ঠপোষক। সাপ্তাহিক সন্ধানী পত্রিকা ছাড়াও সন্ধানী প্রকাশনী নামে একটি অভিজাত প্রকাশনা সংস্থাও ছিল গাজী ভাইয়ের।'

বিভুরঞ্জন সরকার বেলাল চৌধুরীর কবিতা নিয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবার বলেন, 'বেলাল ভাই ছিলেন কিছুটা আলাভোলা ধরনের মানুষ। তার চলনবলন ছিল একেবারেই সাদামাটা। মানুষের উপকার করার জন্য সারাক্ষণ

যেন একপায়ে খাঁড়া থাকতেন। তিনি যখন ভারত বিচিত্রার সম্পাদক তখন কতোজনকে যে ভারতের ভিসা পেতে সাহায্য করেছেন, তার হিসাব নেই। আমি একবার চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাওয়ার জন্য জরুরিভাবে ভিসা প্রয়োজন ছিল। বেলাল ভাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হলে তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে হাতে হাতে ভিসা করিয়ে দিয়েছেন।'

কবিতার বারবার বাঁক বদল সম্পর্কে বেলাল চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- 'কবিতা কোনো আদর্শকে সামনে ধরে বদলায় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার অনেক বদল হয়। সেই চিন্তা থেকে কবিরাও বদলায়। কবিতার ভাষা কাউকে সামনে রেখে, তাকে অনুকরণ, অনুসরণ করে বদলায় না। এটা আসে কবির ভেতর থেকে। পরিবর্তিত ভাষাটা কবি তার নিজের ভেতর থেকেই অর্জন করেন। সেটা তার দেখা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে হয়।' আপনি বলেছেন, একজন ক্লান্তদর্শী কবি গাঁয় গাঁয় জন্মায় না। যেকোনো দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এক শতাব্দকালে হয়তো একজনই জন্মান, যিনি একই সঙ্গে হৃদয় প্রক্ষালক, সর্বজ্ঞ, বিদ্বান ও সর্বদ্রষ্টা। সাম্য, মৈত্রী এবং জাতি ও ভাষাগত বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্রে কবিরা চিরকালই আপসহীন। কণ্ঠে তাঁদের মানবতার জয়গান অনস্বীকার্যভাবে থাকবে।'

একজন বড়ো কবি মূলত এমনই হয়। নিজেকে এক পাশে রেখে অন্যের প্রশংসায় মোহিত হন। বেলাল চৌধুরীর তার সবটা ছিলেন। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বিশ্বের অনেক বড়ো ও নামী কবি লেখকের। বেলাল চৌধুরী এই সম্পর্ক রক্ষা করেছেন খুবই স্বাভাবিকভাবে। এর জন্যে বেলাল চৌধুরীর আলাদা আলাদা কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

০৩

ঘুরে আসি কবি বেলাল চৌধুরীর কবিতার জগতে। তিনি যে জগতের বাসিন্দা ছিলেন সেখানে তিনি অঘোষিত সম্রাট ছিলেন। 'আত্মপ্রতিকৃতি' নামের কবিতায় তিনি লিখছেন :

সারাদিন আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে
কী দেখেছিলাম? ভাট ফুল, আকন্দের ঝোপঝাপ
মাছরাঙাদের অকারণ খিটিমিটি?

আমি কবির সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলব, এসব এখন আমাদের আর নেই। একদিন এসব ছিল আমাদের ঐতিহ্য। এখন সেসব হারানো ঐতিহ্য। আমরা কখনই নিজেদের ঐতিহ্যের গুরুত্ব বুঝিনি। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হই। এই যে প্রভাবিতকরণ তা কেবল কবির দুঃখবোধকে জাগিয়ে তুলে ভাসিয়ে দেয়

কষ্টের সাগরে। কবি প্রতিনিয়ত ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে। ঘুরেছেন শহরের অলিগলি। হেঁটেছেন রাজপথ। আবার আলপথ ধরে হেঁটেছেন গ্রামের পর গ্রাম। কিন্তু চেনাজানা এই আলপথ তিনি কোথাও গিয়ে হারিয়ে ফেলেননি। বরং বার বার সামনে এসেছে। এই ইতিহাস সহজাত। এটি কখনই ভোলার মতো নয়, ভোলা যায়ও না। বাংলার এই রূপ, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য পৃথিবীর কোথাও দ্বিতীয়টি নেই। তা কবি হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে টের পেয়েছেন।

বেলাল চৌধুরী আবার স্মরণ করলেন জসীমউদ্দিনের আঁকড়ে ধরা হারানো জিনিস।

গ্রামীণ ছবিতে আজ আর নেই সেই কিংবদন্তীখ্যাত
মসলিন, নকশিকাঁথার দিন।
গোলায় ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ
এ জাতীয় কথারা আজ সেরেফ কথার কথামালা
গ্রামগুলি হতশ্রী

আমরা এখন নকশিকাঁথা, মসলিন হারিয়ে খুঁজি। অথচ ফিরে পাইনি আগের সেই ঘ্রাণ। আবেগ আর উচ্ছ্বাসিত ঘন মুহূর্ত। গোলায় ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরুও নেই। এখন আমরা আধুনিক থেকে অতিআধুনিক হয়ে উঠছি। এই অতি আধুনিকতার কল্পে মূলত হারাতে বসেছি নিজস্বতা। ভুলে যাচ্ছি পূর্ব পুরুষের সংগ্রামের কথা। এই পরম্পরা ভুলে যাওয়ার ফলে একদিন আমরা হয়ত ভুলে যাব বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। যে ভাষা আন্দোলনে জীবন বিসর্জন করেছেন সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার। আমরা ভুলে যাব ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচন সর্বোপরি উনিশ শত একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। যা কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সব অতীত ভুলে যেতে নেই। আবার পালটে ফেলাও ঠিক হবে না। আমরা আমাদের স্বপ্নের পতাকা নিশ্চয়ই আকাশে উড়তে দিব, তবে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলতে না দিয়ে।

'সেলাই করা ছায়া' কবিতায় লিখেছেন :

শহরতলি ছাড়িয়ে লোকালয়কে বানিয়ে বহুদূরের ধূ-ধূ
বুক ভরে টাটকা সতেজ সবুজ নিঃশ্বাস নিতে নিতে
গহীন বনের কিনারায় এসে দেখি তাকে,
গৈরিক বসনাবৃত পরম নিবিষ্টচিত্ত একা একা বসে,
কে তিনি পথিক না পরিব্রাজক?

আমার মনেও আজন্ম জিজ্ঞাসা ছিল আপনি মানুষ, না কবি, না পরিব্রাজক? কারণ আপনি শহরতলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে লোকালয়কে বানিয়েছেন বহুদূরের ক্লান্ত

ধূ-ধূ। অথচ আপনি ৮০ বছর আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন আমরা আপনাকে চিনতে পারলাম না। এমন আক্ষেপ নিয়েই পরবর্তী জীবন কাটিয়ে দিতে হবে হয়ত। কিন্তু দুঃখ শেষ হবে না। কারণ, আমরা তাকে চিনতে পারিনি। অথচ তিনি আমাদের মতোই ছিলেন। আমাদের মাঝেই ছিলেন।

পাঠক যখন কবি বেলাল চৌধুরীর নাম স্মরণে আনেন তখনই সামনে দাঁড়ায় 'প্রতিনায়কের স্বগতোক্তি' কবিতাটি। কি নেই এই কবিতায়, অনিন্দ্য সুন্দর কারুকাজময় ভাষার প্রয়োগ। চমৎকার ব্যবহার ও বিশ্লেষণ। আর সব শিল্পগুণের দারুণ সমাবেশে কবিতাটি পেয়ে যাবে অমরত্ব।

আমার গোপন পাপগুলি এতদিন পর
বিরূপ-বৈরিতায় শস্ত্রপাণি হয়ে উঠেছে
এবার তাদের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে
উচ্চারিত হলো- আমার কঠোর দণ্ডাজ্ঞা
আমার মাথার ওপর উত্তোলিত তীক্ষ্ম কৃপাণ
চোখের সামনে জ্বলন্ত লাল লৌহশলাকা
ওদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এবার ওরা অটল
আমার সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরেছে মাছির মতো
বিস্ফোটক দগদগে ঘা পুঁজ আর শটিত গরল
গোপন পাপের শরশয্যায় শুয়ে আমি
নিদারুণ তৃষ্ণায় ছটফট করছি- হায় রে জলধারা
কিন্তু এবার ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ- নিষ্কৃতি নেই আমার
নির্বাসনে মৃত্যুদণ্ড- ঠান্ডা চোখে দেখছি আমি
নীল কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে আমার দেহ।

বেলাল চৌধুরী একজন জাত কবি। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর এই কবিতার বহুত্ববাদ ও সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের ভেতর আবছা আলোর মতো তিনিই যেন এই কবিতা। 'আমার মাথার ওপর উত্তোলিত তীক্ষ্ম কৃপাণ/ চোখের সামনে জ্বলন্ত লাল লৌহশলাকা'। বেলাল চৌধুরী সেই তীক্ষ্ম লাল লৌহশলাকার ভেতর দিয়েই জীবনকে যাপন করে সামনের দিনগুলো তরুণপ্রজন্মের জন্য করেছেন অধিকতর বাসযোগ্য। অধিকতর সুন্দর। যদিও আমরা সেই সুন্দরের পূজারী। অথচ এই সুন্দরের জন্যে একজন কবিকে কঠিন নির্মাণের পথে যেতে হয়। তিনি কবিতায় যখন বলেন, আমার সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরেছে মাছির মতো/ বিস্ফোটক দগদগে ঘা পুঁজ আর শটিত গরল। বাস্তবতা এটাই। কবি সব সময় এমন কষ্টের ভেতর দিয়ে সুন্দর উপহার দেন পাঠককে। পাঠক নিবেদিত মনে সেসবে আপ্লুত

হয়। খুশির তরজমা পাঠ করে। উন্মাদের মতো শব্দ আওড়ায়। কবি তখন দূর থেকে দু'ফোঁটা জল ছাড়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে।

আবার যখন বলেন, 'নীল কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে আমার দেহ।' কী সাংঘাতিক মর্ম বেদনার উপলব্ধি। নীল কুয়াশায় ঢেকে গেলে বিষাদের আঙুল সেখানে ইশারা করে ভিন্ন কোনো জগতের দিকে। কবি বাস্তবতার নিরিখে সেই জগতের দিকেই ছুটে গেছেন। ছুটে গেছেন না ফেরার দেশে। যেখানে গেলে কবি আত্মা হয়ে যায় পাখি। পাখি হয়ে বিচরণ করে পুরো পৃথিবী। তখনও কবি দেখেন পৃথিবীর মানুষের দুঃখ, কষ্ট কিংবা সুখ।

তিনি এই কবিতায় বলে গেছেন মৃত্যুর মতো সুন্দরের কথা। মৃত্যুর মতো সত্যের কথা।

'কিন্তু এবার ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
নিষ্কৃতি নেই আমার
নির্বাসনে মৃত্যুদণ্ড
ঠান্ডা চোখে দেখছি আমি'

নিজেকে তিনি জীবন থেকে, সংসার থেকে কিংবা যাবতীয় কর্ম থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছেন/ চেয়েছেন। ঠান্ডা চোখে মৃত্যুকে দেখেছেন। দেখতে দেখতে তিনি দেখলেন মৃত্যুর মতো শীতল পরিতাপকে। যেখানে তিনি আবদ্ধ থাকবেন অনন্তকাল। সেই অনন্তকালের বর্ণনায় বলেছেন, 'নীল কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে আমার দেহ।'। এরপর একটা যুগের অবসান হতে দেখল বাংলা সাহিত্য। একটা সত্যিকার সাহিত্য সম্রাটের প্রস্থানমালা দেখলাম আমরা। যিনি মৃত্যুতেও সুন্দর হেসেছেন। সত্যিকারার্থে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছেন নতুন জীবন। পেয়েছেন অমরতা। যদিও একজন কবি অমরতাকে প্রত্যাখান করে হেসে উঠতে পারেন। কারণ, কবি জানেন অমরতা দিয়ে কিছু হবে না। তারপরও কবি নিমগ্ন সন্ধ্যার সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। সকালের উদিত সূর্যের জৌলসের বর্ণনা করেন। ঘাসের উপর জমে থাকা শিশিরের বর্ণনা করেন। শিশির বিন্দুতে সূর্যের বিকিরণের মণি-মুক্তার বর্ণনা করেন। এই বর্ণনার অর্থ হলো, চিন্তাকে প্রসারিত করা। মানব জাতিকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখা। কবি সব সময়ই মানুষের চিন্তাকে এগিয়ে নিতে কাজ করে থাকেন।

বেলাল চৌধুরী মূলত তাঁর কবিতায় সেই কাজটিই অনায়াসে করে গেছেন। বলা যায়, বেলাল চৌধুরী তাঁর কবিতা-চিন্তায় আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বেঁচে থাকবেন।♦

সাবেক অগ্রপথিক নির্বাহী সম্পাদক বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ

অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র)

মনি খন্দকার

আসার একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণ থাকলেও যাবার কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। নবী, রাসূল, রাজা, সেনাপতি সবাইকে একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পর চলে যেতে হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন প্রখ্যাত লেখক গবেষক পীরে কামিল অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র)। কর্মের আলো সমাজে প্রতিফলিত হলে সমাজ সে জীবনকেও আলোকিত করে তোলে। উপমহাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্ধকার দূরীভূতে যারা কালে কালে প্রজ্ঞা ও চেতনার আলোয়

মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে পীর বা অলি-আউলিয়াগণ অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর যেসব অলি উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে প্রজ্ঞার বীজ বুনেছেন অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র) তাদের মধ্যে সমৃদ্ধ। তার বংশের অনেক অলি-আউলিয়া ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইতিহাস গবেষণায় জানা যায়, উক্ত বংশের পূর্বপুরুষ ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগর থেকে এসে দিল্লিতে আস্তানা গাড়েন। বংশানুক্রমে তারা উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র) একাধারে প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, কবি, ছড়াকার, ইতিহাসবেত্তাসহ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ এপ্রিল মাগুরা জেলার ঐতিহাসিক পীর ও জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক, বিটিভির নিয়মিত ইসলামিক অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আউলিয়াদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি পীরদের পীর ছিলেন। তার কাছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দরবার ও খানকা শরিফের পীর সাহেব ও খলিফারা এসে ইলমে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ধৈর্য সহকারে শুনে সেসবের উত্তর দিতেন। ভক্তরা তার জ্ঞানগর্ব দিক-নির্দেশনাসমূহ তন্ময় হয়ে শুনতেন। তার আব্বা হুজুর প্রখ্যাত অলিয়ে কামিল দ্বারিয়াপুর স্টেটের জমিদার হজরত শাহ সুফি তোয়াজ উদ্দীন (র) প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীর পীর তোয়াজ উদ্দীন গার্ডেনের খানকা শরিফে প্রতি সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক জিকিরের মাহফিল ও প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মাসিক মাহফিল হতো। এই দুটো মাহফিলে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থেকে মুরিদ মুতাকিদের তাহাজ্জুর ফয়েজ দিতেন। হুজুর পবিত্র কোরআন মজিদ ও সিয়াসিত্তার হাদিস গ্রন্থ থেকে ইলমে তাসাউফের ওপর দীর্ঘ আলোকপাত করতেন। সেসব মাহফিলে উপস্থিত থাকতেন দেশের ওলামায়ে মাশায়েখসহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কিছু খাস মুরিদান। লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক সময় ভক্তদের সবার সাক্ষাৎ দেওয়া সম্ভব হতো না, কিন্তু কলমি জিহাদের মাধ্যমে তিনি সমাজসেবা ও তার কমিটমেন্ট সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিতেন। তিনি ২০০৬ সালে তার একমাত্র পুত্রসন্তান আলহাজ আরিফ বিল্লাহ মিঠুকে মদিনা মনোয়ারায় নিয়ে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকের সামনে দ্বারিয়াপুর শরিফের পির খিলাফতের পাগড়ি পরিয়ে দেন। সেই থেকে দেশের বিভিন্ন মাহফিলে মিঠু হুজুর দ্বারিয়াপুর শরিফের তালিম তালকিন পরিচালনা করে আসছেন।

৬ অক্টোবর '২০ ইন্তেকাল করেন হাসান আবদুল কাইয়ুম (ইন্নালিল্লাহি ওয়া.....রাজিউন)। মৃত্যুর পরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার মরদেহকে রাষ্ট্রীয় গার্ড অব অনার দেয়া হচ্ছে

অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম ১৯৬২ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ মাদ্রাসা থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইংরেজি সাধারণ শিক্ষা লাভের জন্য কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। জীবনের কৃতকর্মের জন্য জাতীয় লেখক পরিষদের নববর্ষ পুরস্কার ১৩৯৭, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের নজরুল স্বর্ণপদক ১৯৯৬, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের মওলানা ভাসানি স্বর্ণপদক ১৯৯১, আধ্যাত্মিক কবিতা পরিষদের সাহিত্য সম্মাননা ২০০০, মুসলিম সাহিত্য সমাজের শান্তি পদক ২০০৯ প্রাপ্ত হন। তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে তমুদ্দুন মজলিস, ইনস্টিটিউট অব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বাংলাদেশ রূহানি দাওয়াত অন্যতম।

তাঁর রচিত তিন হাজারের অধিক প্রবন্ধ এবং বহুসংখ্যক কবিতা ও ছড়া আছে। হুজুরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে অনুপম আদর্শ, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানি, খোকাখুকুর ছড়া, ফুরফুরার চাঁদ, জিহাদ কাদরিয়া তরিকা,

সাব্বির কাব্যে, ইসলামী ভাবধারা, ইসলাম ও জীবন, প্রসঙ্গ ইসলামসহ অন্যান্য গ্রন্থ। ইসলামিক বিশ্বকোষে তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বহু খণ্ডে সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে বুখারি শরিফ প্রকাশিত হয়। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের খ্যাতনামা পত্রিকা অগ্রপথিকেরও নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেকবার জলপথ ও আকাশপথে পবিত্র হজব্রত পালন করেন এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেন। লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। প্রেসিডেন্ট কাদরিয়া তরিকার বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অধিকাংশ লেখাই এখনো গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়নি।

অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুমের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মূল দর্শন ছিল পবিত্র কোরআনুল করিম ও পবিত্র হাদিস শরিফের নির্যাস। তিনি তাঁর রচিত প্রবন্ধ নিবন্ধ, কবিতা, ছড়া ও বিভিন্ন রচনায় কোরআন মজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বীজ বপণ করে গেছেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের একজন দক্ষ সেনানি হিসেবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে ইস্তেহাদ করেছেন। যেখানে সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্রনীতি, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধসহ মানবজীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। আবেগ আচ্ছাদিত হয়ে কোনো রচনাকে তিনি অযথাই অলংকৃত করেননি। সাবলিল ভাষায় রচিত তার লেখা ছিল সবার কাছে বোধগম্য। ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের সঠিক দিকনির্দেশনার কারণে তার সমসাময়িক ইসলামিক চিন্তাবিদ ও লেখকদের মধ্যে তিনি অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ ও অলিয়ে কামিল অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওফাত গ্রহণ করেন। দ্বায়িয়াপুর শরিফে তার প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে তোয়াজিয়া এতিমখানা, দেশ-বিদেশে লাখ লাখ মুরিদান ও পাঠককূল তার স্মৃতি বহন করছে। হুজুরের স্মৃতি সংরক্ষণে তার ছেলে, 'পীর অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম (র) ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞার আলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক অনন্ত প্রশান্তির জন্য।♦

লেখক : খলিফা, নীলফামারী দরবার শরিফ
সৌজন্যে : ১৬ অক্টোবর ২০২০, দৈনিক ইত্তেফাক